হত্যা রহস্য
রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

হত্যা রহস্য–৮৫

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ঃ সুখেন দাস

নতুন সংস্করণ ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ ইং

পরিবেশনায় ঃ
বাদল ব্রাদার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি. কে. দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

দাম ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

গম্ভীর কণ্ঠে বললো বনহুর— ডাক্তার, যদি মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেতে চাও তবে রোগিনীকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে ওষুধ দাও। রোগিনীর যদি কোনো ক্ষতি হয় তাহলে মৃত্যু তোমার অনিবার্য।

ডাক্তার রোগিনীর পাশে এসে দাঁড়ালেন, রোগিনীর মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঢোক গিলে ফিরে তাকালেন বনহুরের মুখে, বনহুরের কথাগুলো ভীষণভাবে তাকে ভীত করে তুলেছে।

আশাকে এখন শয্যায় শোয়ানো হয়েছে।

শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে রঘু আর নিয়ং।

বাঘা দু'পায়ের মাঝামাঝি মুখ রেখে বসে আছে, তাকাচ্ছে সে সবার মুখের দিকে। বাঘা যেন সবার কথাবার্তা বুঝতে পারছে, সব যেন জানে সে। এক একবার কটমট করে তাকাচ্ছে সে ডাক্তারের দিকে।

ডাক্তার ভয়বিহবল দৃষ্টি নিয়ে আড়চোখে দেখছেন বাঘাকে। বাঘার বিরাট দেহটা এবং লাল টকটকে চোখ দুটো লক্ষ্য করে শিউরে উঠলেন তিনি। কিন্তু ভয় পেয়ে কোনো ফল হবে না, পালানো সম্ভব নয়, যেমন বনহুর তেমনি বাঘা—ডাক্তারের ফাঁকি দেওয়া চলবে না এখানে।

ডাক্তার তাঁর ওষুধের বাক্স খুলে রোগী পরীক্ষার যন্ত্রপাতি বের করে রোগিনীকে পরীক্ষা করে চললেন। ভালভাবেই পরীক্ষা কাজ শেষ করে বললেন— রোগিনীর অবস্থা মোটেই ভাল নয়, প্রচুর রক্তের প্রয়োজন।

নিয়ং বলে উঠলো—সর্দার, আমি দেবো রক্ত। আশা আমার বড় বোন, তার জন্য আমি জীবন দিতে পারি।

রঘুও বললো—সর্দার, আশার জন্য আমিও রক্ত দেবো, যত রক্ত লাগুক বোন আশাকে বাঁচাতেই হবে.......

বনহুর খুশিভরা কণ্ঠে বললো— তোমাদের কথায় আমি আনন্দিত। ডাক্তার, আপনি ইচ্ছামত এদের রক্ত ব্যবহার করতে পারেন।

ডাক্তার বললেন—কিন্তু রক্ত পরীক্ষা করে দেখতে হবে রোগিনীর দেহের রক্তের সঙ্গে এদের রক্ত চলবে কিনা। যদি চলে তাহলে ভাল, নাহলে রক্তের ব্যবস্থা করতে হবে।

বনহুর বললো—ব্লাডের জন্য যে ভাবে ব্যবস্থা করতে হয় করুন। যদি আমার ব্লাড চলে তাতেও রাজি আছি ডাক্তার।

রঘু আর লিয়ং তাকালো সর্দারের মুখের দিকে। তারা অবাক হলো, সর্দার নিজের রক্ত দিতে রাজি আছেন আশার জন্য!

❑

ডাক্তার এবং বনহুরের চেষ্টায় আশা এবারের মত জীবন রক্ষা পেলো। এত বেশি রক্তের প্রয়োজন হলো যার জন্য রঘু আর বনহুর উভয়কে রক্ত দিতে হলো।

যতদিন আশা সম্পূর্ণ সুস্থ না হলো ততদিন বনহুর হিন্দল ছেড়ে গেলো না, সর্বক্ষণ আশার পাশে থাকতো বনহুর! বাঘাও একদণ্ড ছেড়ে যেতো না আশা ও বনহুরকে।

নীরব প্রহরীর মত বাঘা বসে থাকতো শিয়রে।

ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলো আশা।

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলো আশা, কেউ ভাবতেও পারেনি এ অবস্থা থেকে রেহাই পাবে সে। নবজীবন লাভ করে আশা বনহুরকে দেখলো তার পাশে—আনন্দে মুখ ওর দীপ্ত হয়ে উঠলো, বনহুরকে পাশে পাওয়া তার পরম আনন্দের কথা। আশা বললো—সত্যি তুমি আমার জন্য এত করবে ভাবতেও পারিনি। বনহুর, আমি এবার তোমার জন্যই জীবন ফিরে পেলাম।

বনহুর বললো—না, আমার জন্য নয়, বাঘার জন্য। বাঘা যদি তোমার সন্ধান না দিতো তাহলে তোমাকে খুঁজে বের করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না, সেই রহস্যময় সন্ন্যাসীরা তোমাকে অগ্নিদগ্ধ করে খেতো।

কি দারুণ মুহূর্ত হতে তুমি সেদিন আমাকে বাঁচিয়েছিলে বনহুর জানো সব আমি শুনেছি লিয়ংয়ের মুখে। তুমি আমার জন্য কত কষ্টই না করেছো।

বনহুর বললো—আর তুমি আমার জন্য কতবার। নিজের জীবন বিপন্ন করে মৃত্যুর সঙ্গে মোকাবেলা করেছো আশা। আমি তার প্রতিদানে তোমাকে কিছু দিতে পারিনি। আশা, এখন তুমি সুস্থ হয়ে উঠেছো, এবার আমাকে যেতে হবে।

তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে বনহুর?

একটা কথা তুমি হয়তো শোনোনি—ফাংহার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা।

না তো, আমি ফাংহার হত্যাকাণ্ডের কথা কিছুই শুনিনি!

শুনলে তুমি দুঃখ পাবে আশা। এখন না শোনাই তোমার ভালো।

না, তুমি বসো বনহুর। আর একটু সরে এসো না আমার পাশে। আশা বনহুরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। বিছানায় শুয়ে ছিলো আশা, কারণ সে সুস্থ হলেও অত্যন্ত দুর্বল ছিলো।

বনহুর একটু সরে এলো কাছে।

যদিও বনহুর সব সময় প্রায় আশার কাছাকাছি থাকতো তবু আশা ওকে একেবারে নিবিড় করে পেতো না, কারণ বনহুর সব সময় দূরত্ব বজায় রাখতো, যতদূর সম্ভব সরে থাকতো সে আশার পাশ থেকে।

আশার সাধ মিটতো না, বনহুরকে আরও কাছে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতো সে। বনহুর সরে এলে ওর হাতের মধ্যে হাত রাখলো আশা, বললো—বলো বনহুর, বলো ফাংহার সংবাদ বলো, ফাংহার কথা জানার জন্য আমি উৎসুক—জানো বনহুর, এককালে আমি নিজেও ফাংহায় ছিলাম।

তুমি ফাংহায় ছিলে?

হাঁ, শিশুকালে একবার আমি আমার পিতার সঙ্গে ফাংহায় যাই।

তখন আমার বাবা ঐ দেশে ব্যবসা করতেন। আমার মা ফাংহার অধিবাসিনী ছিলেন কিনা তাই.....

এবার বুঝেছি কেন তোমার এত সখ ফাংহার সংবাদ জানার জন্য? তোমার মা ফাংহার অধিবাসিনী, এ কথা জানতাম না তো?

হাঁ, তবে আমার আপন মা নন, বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন ফাংহায়। বলো বনহুর, ফাংহার সংবাদ কি?

বনহুর বললো—ফাংহায় অদ্ভুত এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়ে চলেছে। প্রায় রাতেই পথেঘাটে পড়ে থাকতে দেখা যায় কোনো না কোনো যুবকের মৃতদেহ। মৃতদেহের বুকের পাশে থাকে একটা অপ্যারেশনের দাগ। কে বা কারা তাদের বুক চিরে বের করে নেয় হৃৎপিণ্ড।

হৃৎপিণ্ড! নিহত যুবকদের বুক চিরে খুনী বের করে নেয় তাদের হৃৎপিণ্ড?

হাঁ, নিশ্চয়ই এটা কোনো নরপশু বৈজ্ঞানিকের কাজ, হয়তো সে হৃৎপিণ্ড দিয়ে নতুন কোনো গবেষণা চালিয়ে চলেছে।

আশ্চর্য বটে!

হাঁ, বড় আশ্চর্য! শুনেছিলাম বিদেশে হৃৎপিণ্ড নিয়ে নানাভাবে গবেষণা চলছে। হয়তো কোনো ব্যক্তির সতেজ হৃৎপিণ্ড নিয়ে কোনো নষ্ট হৃৎপিণ্ড মানুষের বুকে সংযোজন করে সেই মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে সতেজ করে তোলার

চেষ্টা চলছে। জানি না ফাংহায় কোনো ব্যক্তি সেই সাধনায় লিপ্ত হয়েছে কিনা। আমাকে অচিরেই ফাংহায় যেতে হবে। শত শত ফাংহা অধিবাসী আজ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য সদা আশঙ্কিত।

আশা বললো—আমাকে সুস্থ্ হতে দাও বনহুর, তারপর আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

আশা, তোমার জন্য অপেক্ষা করছে রহস্যময়ী। ওর বৃদ্ধ পিতাও রয়েছে, তারা তোমাকে না পেলে পুনরায় জঙ্গলে ফিরে যাবে। আবার তারা অমানুষ হবে, তুমি কি তাই চাও?

না, আমি তা চাই না। আর চাই না বলেই তো ওদের আমি হিন্দল থেকে ঝামে পাঠিয়ে দিয়েছি।

আশা ওদের তুমি ঝামে পাঠিয়ে ভাল করোনি, কারণ তুমি সেখানে নেই—তাদের তো অসুবিধা হতে পারে।

আমি জানি তাদের কোনো অসুবিধা হবে না। বনরাণী আর তার পিতা আমার আস্তানায় চিরকাল আশ্রয় পাবে।

সত্যি আশা, তুমি বড় মহৎ। রহস্যময়ী নারীকে তুমি মানবী আকারে তৈরি করেছো—তারপর তুমি আশ্রয় দিয়েছো নিজ আস্তানায়, তোমার মত হৃদয়বান মহিলা হওয়া বড় কঠিন......

তুমি বেশি বাড়িয়ে বলছো বনহুর! জীবনে কারও কোনো উপকার করেছি বলে আমার মনে হয় না। এবার ফাংহায় তোমার সঙ্গে যাবো এবং তোমার পাশে থেকে তোমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করবো।

তা হয় না আশা, কারণ ফাংহায় আমি আত্মগোপন করে কাজ করবো তাছাড়া তুমি এত বেশি অসুস্থ্.....

আমি মোটেই অসুস্থ্ নই বনহুর। তোমার অক্লান্ত চেষ্টায় আমি সম্পূর্ণ সুস্থ্ হয়ে উঠেছি .... কথার ফাঁকে আশা বনহুরের দক্ষিণ হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে—বলো ফাংহায় যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যাবে? বড় সাধ তোমার সঙ্গে থেকে কাজ করি।

বনহুর কোনো কথা বলে না।

আশা বলে উঠে—বাঘাও যাবে তোমার সঙ্গে। তারপর বাঘার দিকে তাকিয়ে বলে... কিরে বাঘা, যাবি না?

বাঘা বসেছিলো—আশার কথা যেন সে বুঝতে পারে, উঠে দাঁড়িয়ে হাই তুলে লেজ নেড়ে যেন সম্মতি জানায় সে।

আরও দু'দিন কেটে গেলো।

আশা আরও সুস্থ হয়ে উঠলো! একদিন হঠাৎ ডাক এলো ঝাম থেকে আশার। ঝাম জঙ্গলে আশার যে গোপন ঘাটি ছিলো, সেখান থেকে একজন অনুচর এসে হাজির হলো। দীর্ঘদিন আস্তানায় আশা না থাকায় বিশেষভাবে ক্ষতি সাধন হচ্ছে, অচিরে না গেলেই নয়।

বাধ্য হলো আশা আস্তানায় যেতে। অবশ্য বনহুর তাকে বোঝালো সে না গেলে তার বহু কাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

আশা ঝাম জঙ্গলে তার আস্তানায় যাবে বলে রাজি হলো কিন্তু বাঘাকে সে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

বনহুর তাতেই সম্মতি দিলো।

আশা বাঘাকে পাবে, এ জন্য আনন্দের সীমা রইলো না তার। তবে কথা দিলো আশা, যখন বাঘাকে বনহুরের প্রয়োজন হবে তখন ফিরিয়ে দেবে তাকে।

কিন্তু আশা এখন দুর্বল সে পৌঁছবে, এ নিয়ে চিন্তায় পড়লো বনহুর।

আশা নিজেও ভাবছে কিভাবে যাওয়া যায়—বাঘাও যাবে তার সঙ্গে, কাজেই চিন্তার কারণ বটে।

আশা ধরে বসলো বনহুরকে, তাকে পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু বনহুরের এখন ঝামে যাওয়া সম্ভব নয়—তাকে ফাংহায় যেতে হবে, সেখানে প্রতিটি রাত্রে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে চলেছে।

সেদিন বনহুর নির্জনে বসেছিলো—হয়তো ফাংহার হত্যাকাণ্ড নিয়েই ভাবছে কিংবা ভাবছে কান্দাই আস্তানার কথা, এমন সময় আশা এসে দাঁড়ালো তার পাশে, চোখমুখ তার ক্লান্ত ম্লান।

পদশব্দে মুখ তুলে তাকালো বনহুর, আশাকে দেখে বললো—বসো।

আশা বসলো।

বনহুর বললো— তোমার এ ভাবে শয্যা ত্যাগ করে উঠে আসা ঠিক হয়নি।

কাল আমাকে ঝামের উদ্দেশ্যে বিদায় দিচ্ছো অথচ বলছো শয্যা ত্যাগ করা উচিত হয়নি।

হাঁ, সত্য আশা। ঝামে যাবার সময় তোমাকে শয্যা ত্যাগ করতে হবে সত্য কিন্তু.....

বলো, থামলে কেন?

না ত্যাগ করে উপায় নেই, তাই।

বনহুর, তুমি আমার জন্য ভাবো? সত্যিই কি আমি মরলে তুমি ব্যথা পাবে?

বনহুর চোখ দুটো মেলে ধরলো সম্মুখের সীমাহীন আকাশের দিকে, দূরে হাল্কা মেঘগুলো যেখানে ভেসে বেড়াচ্ছিলো সেইদিকে। আশা পুনরায় প্রশ্ন করলো—আমি মরলে তুমি ব্যথা পাবে?

জানি না!

তোমাকে বলতে হবে।

আশা, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জন্য আমার মন কাঁদে। সবাইকে আমি ভালবাসি, তবে যারা অন্যায় কাজ করে তাদের আমি ঘৃণা করি। একটু থেমে বললো—তুমি তো প্রথম পর্যায়ে পড়ছো, কাজেই তোমার জন্য মন আমার কাঁদবেই।

তুমি আমাকে ঝামে রেখে আসবে না বনহুর?

কিন্তু আমাকে যে ফাংহায় যেতে হবে, কারণ আমি চাই ফাংহার হত্যাকাণ্ড যথাশীঘ্র বন্ধ হয়। জানো আশা, প্রতিদিন হত্যাকারী কত নিরীহ মানুষের প্রাণনাশ করে চলেছে। এ মুহূর্তে ঝামে তোমাকে পৌঁছে দিতে গেলে বেশ বিলম্ব হবে। তোমার সঙ্গে থাকবে বাঘা আর রঘু.....

অভিমানভরা কণ্ঠে বললো আশা—ফিরে এসে যাবে তুমি আমার আস্তানায়, কথা দাও?

হেসে বললো বনহুর—আচ্ছা দিলাম।

বললো আশা—একটা কথা!

বলো?

তুমি ভুলে গেলেও আমি ভুলে যাইনি। মনে আছে বন্ধ্যা জঙ্গলে আমি তোমার হাতে পরিয়ে দিয়েছিলাম একটা রক্ষাকবচ?

আছে।

সে কবচ তুমি কি করেছো বনহুর?

আমার আস্তানায় খুলে রেখেছি।

তুমি ভুল করেছো।

কবচ খুলে রেখেছি বলে?

হাঁ, ঐ কবজ তোমার সঙ্গে থাকলে কোনো বিপদ তোমাকে স্পর্শ করতে পারতো না।

ও কবচ তুমি কোথায় পেয়েছিলে?

সে এক অদ্ভুত কাহিনী, কিন্তু আজ তোমাকে সে কাহিনী বলবো না, কারণ কবচটি যখন তুমি বাজুতে ধারণ করবে তখন সময়মত বলবো।

বললো বনহুর—বেশ তাই বলো। আর যদি কবজটি বাজুতে ধারণ না করি?

তাহলে আমি সে কাহিনী কোনোদিনই তোমার কাছে ব্যক্ত করবো না, তাছাড়া আমি বড় দুঃখ পাবো। জানো বনহুর, তুমি আমার কত সাধনার সম্পদ...... যদিও তুমি আমাকে অবহেলা করো। তবুও.....

বনহুরের কথায় আশা আরও দু'দিন অপেক্ষা করলো, তারপর একদিন বিদায় গ্রহণ করলো ঝামের উদ্দেশ্যে।

বনহুর অবশ্য আশাকে বিমানবন্দর পর্যন্ত পৌঁছে দিলো, না দিয়ে কোনো উপায় ছিলো না তাই।

আশা যখন বাঘাকে নিয়ে বিমানে উঠলো তখনও বাঘা জানালাপথে তাকিয়েছিলো তার প্রভুও যাবে তাদের সঙ্গে, তাই সে খুশিতে লেজ নাড়ছিলো বারবার কিন্তু যখন বনহুর বিমানে উঠলো না তখন বাঘার মুখখানা ম্লান হলো। অবশ্য সে পশু তাই তার মুখোভাবে মনের ভাব প্রকাশ না পেলেও চোখ দুটো ছলছল করছিলো।

আশা বারবার রুমালে চোখ মুছলো।

বনহুর এরোড্রামের বাইরে বেরিয়ে এলো যখন তখন আশাকে নিয়ে বিমানখানা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে।

গাড়িতে চেপে বসলো বনহুর।

ড্রাইভার বললো—সর্দার, কোথায় যাবো?

বনহুর বললো—আস্তানায় চলো।

❑

ফাংহার হত্যাকাণ্ড ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে দেশবাসীকে, কারণ প্রতিদিন একটা না একটা যুবক নিহত হচ্ছে! প্রতিটি মানুষের মনে দেখা দিয়েছে ভীষণ এক আতঙ্ক, না জানি কোন্ মুহূর্তে কার ভাগ্যে কি ঘটে বসে!

ফাংহার এই অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড নিয়ে পুলিশবাহিনী নানাভাবে তদন্ত চালিয়ে চলেছেন তবু কোনো কিনারা করতে পারেননি ওই হত্যা রহস্যের। কে এই

হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে চলেছে, তাকে খুঁজে বের করার জন্য শুধু পুলিশ বাহিনী নয়, ফাংহাবাসী সবাই সজাগ হয়ে উঠেছে।

অনেক চেষ্টা করেও যখন এই হত্যাকাণ্ডের কোনো হদিস পাওয়া গেলো না তখন দস্যু বনহুর স্বয়ং এসে উপস্থিত হলো ফাংহা শহরে।

ফাংহার অদূরে এক ডাকবাংলো, সেখানেই উঠলো বনহুর—সঙ্গে তার রহমান ও একটা ছোট চাকর আরজু।

বনহুর বিদেশী নাগরিক হিসেবেই এই ডাকবাংলোয় আশ্রয় নিলো।

উঁচু একটা টিলার উপরে সুন্দর পরিচ্ছন্ন এই বাংলো। বাংলোটা খুব বড় না হলেও মনোরম—পাশাপাশি দুটি কামরা, একটাতে বনহুর ও রহমান, অপরটাতে আগে হতেই এক ভদ্রলোক থাকেন নাম তার মিঃ ইবন। অবশ্য প্রথম দিনই ভদ্রলোক বনহুরের সাথে গায়ে পড়ে আলাপ করে নিয়েছিলেন।

চাকর ছোকরা আর রহমান এসে বাংলোর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিলো, বনহুর বেলকুনির ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট পান করছিলো আর উপভোগ করছিলো সম্মুখস্থ পাহাড়িয়া অঞ্চলের সৌন্দর্য।

জায়গাটা পাহাড়িয়া অঞ্চল! উচুনীচু অনেক টিলা, অসমতল বিস্তৃত এলাকা আর সবুজ তৃণরাশি। মাঝে মাঝে নাম না জানা ছোটবড় গাছ। গাছে গাছে নানা বর্ণের ফুলের সমারোহ।

অপূর্ব সৌন্দর্য বলা যায়।

বনহুর এসেছে খুনীর সন্ধান করতে এবং ফাংহার জনসাধারণকে মৃত্যুভয়াল অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে কিন্তু ফাংহার ডাকবাংলো তাকে মুগ্ধ করে ফেলেছে, করেছে অভিভূত, ভারী সুন্দর লাগছে তার কাছে জায়গাটা।

ডাকবাংলোর অদূরে একটা মহুয়া গাছ। মহুয়া ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা গোটা বাংলো অঞ্চলটা। বনহুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছিলো নতুন জায়গার নতুন মধুময় সৌন্দর্য। মাঝে মাঝে সিগারেট থেকে ধূয়া নির্গত করে চলেছিলো সে।

অবশ্য বনহুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করলেও মন ছিলো তার গভীর এক চিন্তায় আচ্ছন্ন। ফাংহার জনসাধারণ আজ ভীষণ এক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। প্রতি রাতে একটা না একটা লোক জীবন হারাচ্ছে। শুধু মৃত্যুই তারা বরণ করছে না, এক ভয়ঙ্কর বিভীষিকাময় অবস্থার মধ্যে প্রতি মুহূর্ত তারা কালাতিপাত করছে।

বনহুর এই চিন্তায় মগ্ন ছিলো, ঠিক ঐ সময় তার পিছনে এসে দাঁড়ালেন পাশের কামরার ভদ্রলোক। মুখে তাঁর পরিচ্ছন্ন হাসির আভাস, বললেন তিনি—শুভ হোক আপনার জীবন।

চমকে ফিরে তাকালো বনহুর, অবশ্য আশ্চর্য হলো না, কারণ যেদিন সে এ বাংলোয় এসেছে ঐ দিনই সে তাঁকে লক্ষ্য করেছে হাসি-খুশি ভরা একটা মুখ, তবে আলাপ করার সময় বা সুযোগ হয়নি তখন। তারপর এক সময় প্রায় ভুলেই গিয়েছিলো বনহুর তাঁর কথা।

এখন তাঁকে দেখে বিস্মিত না হলেও কিছুটা অবাক হলো, কারণ লোকটা আপনা আপনিই এসেছেন গায়ে পড়ে আলাপ করতে।

ভদ্রলোক বললেন—আমার পাশের কামরায় এসেছেন—কাজেই পরিচয় থাকা ভাল, এলাম আলাপ করতে। আমার নাম ইবন চামড়ার ব্যবসা করি।

এক নিঃশ্বাসে ভদ্রলোক কথাগুলো বলে থামলেন।

বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে বাড়িয়ে ধরলো ভদ্রলোকের দিকে—নিন।

ভদ্রলোক বললেন—আমি সিগারেট পান করি না, কারণ আমার ছোটবেলায় কোনো এক অসুখ হওয়ায় ডাক্তার ধূমপান নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন তাই হাসলেন ভদ্রলোক, তারপর জিজ্ঞাস করলেন—আপনি... মানে আপনার আগমন এখানে কোন্ উদ্দেশ্যে জানতে পারি কি?

বনহুর হেসে বললো নিশ্চয়ই পারেন। আমি .... একটু থেমে কিছু ভাবলো বনহুর, তারপর বললো—আমি কাঠের ব্যবসা করি।

হঠাৎ ভদ্রলোক এমন একটা প্রশ্ন করবেন ভাবতেই পারেনি বনহুর। একটু বিব্রত বোধ করলেও চট করে ভেবে নিতে পেরেছিলো সে, তাই জবাব দিলো আমি কাঠের ব্যবসা করি।

ভদ্রলোক বনহুরের কথায় মোটেই অবিশ্বাস করতে পারেননি, তিনি খুশি হয়ে বললেন—ভালই হলো, আপনি কাঠের সন্ধানে এসেছেন আর আমি এসেছি চামড়ার সন্ধানে। হাঁ, কাঠ কোথায়?

বনহুর হঠাৎ বলে বসেছে কাঠের ব্যবসা করি কিন্তু কাঠ কোথায়? ঘাবড়ে যাবার লোক বনহুর নয়, চট করে সে বললো—কাঠের ব্যবসা করি তাই এখানে এসেছি গাছের খোঁজখবর নিতে... জঙ্গলে খোঁজ করলে ভাল কাঠের সন্ধান পাবো।

হাসলেন ভদ্রলোক— বেশ বেশ, শুভ সংবাদ। আমিও জঙ্গলে যাই চামড়ার খোঁজে, ভাল জীবজন্তু, আছে কিনা। এ জঙ্গলে তারই সন্ধান করে চলেছি। যদি কিছু মনে না করেন তবে আপনার নামটা জানতে পারি কি?

বনহুর শান্ত স্বাভাবিক গলায় বললো—নাম আলম চৌধুরী।

ভদ্রলোক খুশি হয়ে বললেন—বাঃ ভারী সুন্দর নাম তো....মিঃ আলম চৌধুরী। আপনি বুঝি বাঙ্গালি?

ঠিক বাঙ্গালি নই, কারণ আমার বাবা-মা বাঙ্গালি ছিলেন বটে কিন্তু আমার জন্ম বাংলাদেশে নয়।

আপনার জন্মভূমি তাহলে?

কান্দাই।

আপনার জন্মভূমি তাহলে কান্দাই শহরে?

শহরে নয়, কান্দাইয়ের নিভৃত কোনো এক পল্লীতে। কান্দাই আমার মাতৃভূমি, তাই বাঙ্গালির সন্তান হয়েও ঠিক বাঙ্গালি হতে পারিনি।

সে কথা মিথ্যা নয় মিঃ আলম, কারণ আপনার চেহারাটা ঠিক বাঙ্গালির মত নয় কিনা.....

হাসলো বনহুর—তাই নাকি?

হাঁ, কারণ আপনার মত সুন্দর সুপুরুষ বাঙ্গালিদের মধ্যে কম দেখা যায়, তাছাড়া আপনার চোখ দুটো বিশেষ আকর্ষণীয়....

বনহুর সিগারেট কেসটা বের করে আরেকটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো। কোনো জবাব দিলো না সে ভদ্রলোকটার কথায়।

মিঃ ইবন বলেই চলেছেন—আমার স্ত্রী আপনাকে দেখলে মুগ্ধ হবে, খুশিও হবে যথেষ্ট।

বনহুর অবাক কণ্ঠে বললো—আপনার স্ত্রী! কোথায় তিনি, তাকে তো দেখলাম না?

ওঃ তাকে আপনি দেখেননি, সে তার ভাই মিঃ হাবনী মিলনের সঙ্গে মেলায় বেড়াতে গেছে

মেলা! কোথায় মেলা?

কেন, ফাংহার দক্ষিণে পানথা মেলা! আপনি বুঝি এ মেলায় যাননি কোনোদিন?

না।

আপনি বুঝি ফাংহায় নতুন এসেছেন?

একেবারে নয়, এর পূর্বেও কাঠের সন্ধানে একবার এসেছিলাম ফাংহায়।

তবে বেশিদিন থাকা হয়নি বুঝি, তাই ফাংহার সব জায়গা চেনেন না?

ঠিক তা নয়, ছিলাম বেশ কিছুদিন কিন্তু সব জায়গা দেখে উঠা সম্ভব হয়নি।

সেদিন আর বেশি আলাপ হয় না মিঃ ইবনের সঙ্গে, তিনি হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডসেক করে বিদায় নিলেন তখনকার মত।

বনহুর তার নিজের কামরায় প্রবেশ করলো।

ততক্ষণে রহমান ও আরজু কক্ষটা সুন্দর করে গুছিয়ে নিয়েছে।

রহমান বললো—সর্দার, এবার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়।

বনহুর বললো—নিকটেই একটা সরাইখানা আছে, সেখান থেকে খাবারের ব্যবস্থা করো।

রহমান তখন হাতের পিঠে ললাটের ঘাম মুছে নিয়ে আরজুর দিকে তাকালো, কারণ রহমান আরজু সহ যাবে খাবার আনতে।

আরজু বনহুরের পুরোন অনুচর নয়, তাকে সংগ্রহ করেছে রহমান নতুন। তবে ছেলেটা ভাল এবং সরল ও বিশ্বাসী। রহমান ওর ব্যবহারে খুশি হয়েই ওকে নিয়েছিলো নিজেদের সহায়তার জন্য।

রহমান আরজুকে লক্ষ্য করে বললো—চলো যাই, সরাইখানা থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসি।

আরজু কোনো জবাব না দিয়ে অনুসরণ করলো রহমানকে।

বনহুর বিছানায় দেহটা এলিয়ে দিলো। এতক্ষণ নানারকম কথাবার্তায় ক্ষণিকের জন্য সে ভুলেই গিয়েছিলো ফাংহার অদ্ভুত হত্যাকাণ্ডের কথা। পাশের কামরার মিঃ ইবনের কথাগুলো মনে পড়ছিলো বারবার। লোকটা চামড়ার ব্যবসা করেন, তাই তিনি এসেছেন নিভৃত এই ডাকবাংলোয়। মুখে পরিচ্ছন্ন হাসির আভাস, লোকটা গায়ে পড়ে আলাপ করতে এসেছিলেন, মন্দ না ভদ্রলোক—যাক, এই নির্জন বাংলোয় তবু একজন সঙ্গী পাওয়া গেলো। হঠাৎ চিন্তাধারা বিছিন্ন হলো বনহুরের, পদ শব্দে মুখ তুলে তাকালো সে, দেখলো একটা বয় খাবারের ট্রে হাতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করছে।

সে কোনো কথা না বলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো খাবারের ট্রে হাতে নিয়ে।

বনহুর ভাবলো, রহমান ও আরজু না এসে শুধু বয়কে পাঠালো কেন? হয়তো বা ওরা খেয়ে নিয়ে আসবে, সরাইখানা থেকে বয়কে পাঠিয়েছে তার খাবার নিয়ে। বনহুর বললো—রেখে যাও ঐ টেবিলে।

বয় নীরবে খাবারের ট্রে ঢাকা দিয়ে রেখে বেরিয়ে গেলো নিঃশব্দে।

বনহুর পুনরায় তলিয়ে গেলো গভীর চিন্তায়।

আজই তারা প্রথম এসেছে ফাংহায়। রহমান আর আরজু তার সঙ্গী আরজু ছেলেটা মন্দ নয়, সে বেশ কাজের। বয়স তার বাইশ কিংবা চব্বিশ হবে, স্বাস্থ্য ভাল, সুন্দর চেহারা। হয়তো বা কোনো ভদ্রঘরের ছেলে সে, তাই তার চেহারায় বোঝা যায় তার বংশ পরিচয়। বনহুর অবশ্য ওর ব্যাপারে বেশি করে জিজ্ঞাসাবাদ করেনি কোনোদিন রহমানের কাছে। অবশ্য বনহুর জানতো, রহমান এমন লোককে রাখবে না যার মধ্যে কোনোরকম সন্দেহের ছোঁয়াচ আছে।

এখানে আসার পর তারা প্রথম উঠেছিলো ফাংহার বিমান ঘাটির অদূরে বড় একটা হোটেলে। সেখানে অবশ্য ঘন্টাকয়েক ছিলো তারা, তারপর সেখান থেকে সোজা একটা ট্যাক্সি করে এসেছে এই নির্জন ডাকবাংলোয়। ভেবেছিলো বনহুর, এ ডাক বাংলোয় সে একাই উঠেছে কিন্তু তা নয়, অপর এক ব্যক্তি পূর্ব হতেই ডাকবাংলোয় আস্তানা গেড়ে বসে আছেন—তিনি হলেন মিঃ ইবন। পরে অবশ্য বনহুর জানতে পারলো শুধু ইবন নন, এই ডাকবাংলোয় মিঃ ইবনের সঙ্গে থাকে আরও দু'জন, তাঁরা হলেন ইবনের স্ত্রী ও স্ত্রীর সহোদর মিঃ হাবসী মিলন—তাঁরা তখন গেছেন কোনো এক মেলায় বেড়াতে। অদ্ভুত এক পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তার, মন্দ নয়— মিঃ ইবন.....

কিন্তু রাত বাড়ছে, রহমান আর আরজু এতক্ষণও ফিরে এলো না, ব্যাপার কি?

বনহুর ভাবছে ওরা এলেই সে হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসবে কিন্তু ওদের ফিরবার কোনো নাম নেই যেন। বনহুর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে। আবার সে তলিয়ে যায় গভীর চিন্তায়। একটার পর একটা পত্রিকা মেলে ধরে সে চোখের সম্মুখে।

এগুলো ফাংহার দৈনিক সংবাদপত্র। প্রথম পৃষ্ঠায় রয়েছে ফাংহার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের আলোকচিত্র। বনহুর সংবাদপত্রগুলো মেলে ধরে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করে চলে। প্রতিটি আলোকচিত্রে রয়েছে নিহত যুবকের মৃতদেহ,

সমস্ত দেহ অক্ষত কিন্তু বুকের একপাশে একটা ক্ষতচিহ্ন দেখা যাচ্ছে, ঠিক বুকের মাঝামাঝি, তবে কতকগুলো নিহত যুবকের দেহ থেকে মাথাটা যেন আলগোছে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয়েছে। দু'চারটে পত্রিকায় মস্তকবিহীন লাশ দেখা যাচ্ছে।

রহমান এই সংবাদপত্রগুলো সংগ্রহ করেছিলো বেশ কিছুদিন থেকে, অবশ্য বনহুরের নির্দেশমতই এগুলো সংগ্রহ করেছিলো সে।

বনহুর পত্রিকাগুলো দেখা শেষ করে যখন এক একটা ভাঁজ করে রাখছিলো তখন রাত প্রায় বারোটা বেজে গেছে। বনহুর যেন চমকে গেছে অথচ রহমান ও আরজু ফিরে আসেনি এখনও ব্যাপার কি! এতক্ষণ বনহুর তন্ময় হয়ে সংবাদপত্রগুলো দেখছিলো, এতক্ষণে হুশ হলো তার। হাতঘড়িটার দিকে পুনরায় লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো মেঝেতে। তারপর দ্রুত দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো, অদূরে সরাইখানার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভাবলো রহমান আর আরজু এতক্ষণ এলো না কেন? দূরত্ব তো আর বেশি নয়, মাত্র কয়েক মিনিটের পথ।

বনহুর পায়চারী করে চললো বাংলোর বারান্দায়। ও ঘরে তখন আলোটা অল্পসল্প জ্বলছিলো, মনে হলো মিঃ ইবন রাতের আহার সমাধা করে শয্যা গ্রহণ করেছেন এবং সে কারণেই আলোটা ডিম করে রাখা হয়েছে।

ক্রমে অধৈর্য হয়ে উঠলো বনহুর

পায়চারী বন্ধ করে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলো, সে, টেবিলে খাবার ঢাকা দেওয়া আছে, সেদিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিলো। হঠাৎ তার মনে একটা চিন্তার উদ্ভব হলো—রহমান বা আরজু না এসে বয়কে পাঠালো কেন? খাবার নিয়ে তাদেরই তো আসার কথা ছিলো। তা ছাড়া রহমান তো জানে আজ সর্দার অত্যন্ত ক্লান্ত আছেন, কারণ বনহুর প্লেনে বা জাহাজে আসেনি, সে এসেছে তার অশ্ব তাজের পিঠে।

কান্দাই থেকে ফাংহা আসা কম কথা নয়, হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে এসেছে বনহুর। অবশ্য দুঃসাহসী বনহুর বলেই এতটা পথ অশ্বযোগে আসতে সক্ষম হয়েছে, নাহলে হয়তো এত পথ কেউ অশ্বপৃষ্ঠে আসতে সক্ষম হতো না!

বনহুর তাজকে ফাংহার বাইরে তার নিজস্ব আস্তানায় রেখে এসেছে। প্রয়োজনবোধে তাজকে কাছে নিয়ে আসবে সে। রহমান আর আরজু

এসেছিলো জাহাজে, তারা এক সপ্তাহ পূর্বে রওনা দিয়েছিলো কান্দাই থেকে। সর্দার পৌঁছবার মাত্র একদিন পূর্বে তারা পৌছে গিয়েছিলো ফাংহায়।

বনহুর ক্ষুধা অনুভব করে।

বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে আসে, তারপর চেয়ার টেনে খাবার টেবিলে বসে যেমন সে খাবারের ঢাকনা খুলে ফেলে অমনি ভীষণভাবে চমকে উঠে—খাবারের ট্রের উপরে রেকাবিতে একটা নরমুণ্ড। জমাট তাজা রক্তে রেকাবিটা ভরে আছে। বনহুর ভালভাবে লক্ষ্য করতেই শিউরে উঠলো—এ যে আরজুর মাথা!

বনহুরের দেহের রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠলো। সমস্ত শিরাগুলো শক্ত হয়ে উঠলো দড়ির মত করে। যে কারণে, যে হত্যারহস্য উদঘাটন ব্যাপারে তার ফাংহায় পদক্ষেপ, সেই হত্যারহস্যই তাকে অভিবাদন জানালো প্রথম রাতে। বনহুরের মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠলো—খুনী ফাংহায় তার আগমন ও উদ্দেশ্য জানতে পেরেছে। প্রথম দিনই সে তার শক্তি ও বুদ্ধির পরিচয় দিলো। এটা তার প্রতি খুনীর বিরাট একটা চ্যালেঞ্জ।

কিছুক্ষণ বনহুর স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো ছিন্ন মস্তকটার দিকে তাকিয়ে। একটা ব্যথা খচ্ খচ্ করে উঠলো তার মনের গহনে, কিছু পূর্বেই এই যুবক তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলো নত মস্তকে। রহমানের কথায় সে তাকে অনুসরণ করে সরাইখানায় গিয়েছিলো। তারপর রহমান বা সে ফিরে আসেনি, এখন প্রায় রাত একটা বেজে বিশ মিনিট অতিক্রম করেছে। বনহুরের ক্ষুধা-পিপাসা উবে গেলো মুহূর্তে। কে এসেছিলো খাবার নিয়ে, তবে কি সরাইখানার লোক নয় সে? কিন্তু রহমান গেলো কোথায়, তার হলো কি?

বনহুর উঠে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, সেখান থেকে দেখা যায় অদূরস্ত সরাইখানায় স্বল্প আলোকরশ্মি।

বনহুর কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো, তারপর ফিরে এলো টেবিলের পাশে, আলগোছে ঢেকে রাখলো আরজুর ছিন্ন মস্তকখানা। পাশের কামরায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন মিঃ ইবন, তাঁকে জাগানো সমীচীন মনে করলো না বনহুর।

বনহুরের ললাটে ফুটে উঠেছে গভীর চিন্তারেখা, আরজু নিহত হলো—খুনীর সন্ধানে এসেছে তারা অথচ প্রথমেই হলো খুন তারই একজন বিশ্বস্ত লোক। কিন্তু রহমান গেলো কোথায়? আরজু তো রহমানের সঙ্গেই গিয়েছিলো সরাইখানায়। তবে কি রহমানকেও হত্যা করেছে খুনী? কে সে খুনী যার এত সাহস তারই অনুচরকে নিহত করে?

বনহুর পায়চারী করতে লাগলো, ক্ষুধা-পিপাসা অন্তর্হিত হয়েছে কখন সে নিজেও টের পেলো না। রাত বাড়ছে, বনহুর টেবিলের পাশে ফিরে গেলো, রেকাবির ঢাকনা সরিয়ে নিলো আলগোছে। সদ্য দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা মাথা! সূতীক্ষ্ণ ছোরা দিয়ে নিপুণভাবে দেহ থেকে মাথাটাকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয়েছে। চোখ দুটো অর্ধমেলিত, ঠোট দু'খানা ঈষৎ স্ফীত-গলাটার চারপাশে চাক করে কেটে ফেলা হয়েছে, লাল টকটক করছে বিচ্ছিন্ন অংশটা। বেচারা আরজু.....বনহুর রেকাবি সহ আরজুর মাথাটা তুলে নিলো হাতের উপর, তারপর বাংলোর বাইরে বেরিয়ে এলো সে।

রেকাবি সহ মাথাটা নিয়ে সে সোজা চলে গেলো মহুয়াতলায়। অন্ধকার রাত, মহুয়া তলায় জোনাকির আলো পিট পিট করে জ্বলছে। বনহুর তার ছোরাখানা বের করে দ্রুতহস্তে কিছুটা মাটি সরিয়ে ফেললো, তারপর রেকাবিসহ মাথাটা গর্তে রেখে মাটি চাপা দিলো।

অন্ধকার হলেও তেমন অসুবিধা হলো না বনহুরের, আরজুর ছিন্ন মাথাটা গর্তে চাপা দিয়ে ফিরে এলো সে ডাকবাংলোয়।

বনহুর পোশাক পরিবর্তন করে নিলো, তারপর বাংলোর দরজায় তালা বন্ধ করে সরাইখানার দিকে পা বাড়ালো।

আধ ঘন্টার মধ্যেই বনহুর পৌছে গেলো সরাইখানায়। ডাকবাংলো থেকে যে সরাইখানার আলোকরশ্মি ক্ষীণ এবং ক্ষুদ্র লাগছিলো এখন তা তীব্র আর স্পষ্ট লাগছে।

সরাইখানা এখনও বন্ধ হয়নি, দুচারজন লোক টেবিলে বসে খানাপিনা খাচ্ছে। তবে যারা এখনও খানাপিনা করে চলেছে তারা শ্রমিক কিংবা পথচারী হবে।

কয়েকজন বয় ওধারে খালি টুলে বসে বসে ঝিমুচ্ছে। সরাইখানায় মালিক সমস্ত দিনের হিসেব-নিকেশ করা নিয়ে ব্যস্ত।

বনহুরকে দেখতে পেয়ে মাথা তুললো সরাইখানার মালিক এবং বয়দের লক্ষ্য করে বললো—এই, খদ্দের এসেছে, দেখ্ কি লাগবে।

বনহুর ততক্ষণে বসে পড়েছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে একটা টেবিলের পাশে। চোখ দুটো যেন তার ঘুমে ঢুলু ঢুলু করছে, এমনি ভাব নিয়ে বারবার হাই তুলে বললো—খানা নিয়ে এসো।

খাবার এলো।

বনহুর তৃপ্তিসহকারে খেলো, তারপর বললো—কত বিল হয়েছে?

বয় হাঁকলো খাবারের বিলের হিসাব।

বনহুর পকেট থেকে টাকা বের করে দিলো, তারপর বখশিস হিসেবে দু'খানা দশ টাকার নোট রাখলো বিলের রেকাবিতে।

বয়ের চোখ দুটো খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠলো, সে আলগোছে তুলে নিলো নোট দু'খানা।

বনহুর বললো—রাতের জন্য একটা কামরার দরকার-বন্দোবস্ত হবে কি?

বয় মালিককে জানালো।

মালিক বললো—ব্যবস্থা করে দাও, এত রাতে ভদ্রলোক না হলে যাবেন কোথায়?

বয় বললো—আসুন।

বনহুর হাই তুলে উঠে দাঁড়ালো, কোটটা খুলে কাঁধে নিয়েছে সে। এগুলো বনহুর বয়টার সঙ্গে। ছোট্ট কাঠের সিড়ি, ঐ সিড়ি বেয়ে উঠে গেলো বয় উপরের দিকে।

বনহুর ওকে অনুসরণ করছে।

বয়ের সঙ্গে বনহুর যখন কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিলো তখন সরাইখানার মালিক কেমন যেন বাঁকা চোখে তাকাচ্ছিলো তার দিকে। বনহুর একটা সিগারেট ধরানোর জন্য একটু থেমে আড়চোখে দেখে নিলো মালিক। কেমন যেন বিদ্‌ঘুটে চেহারা—মাথার চুলগুলো সজারুর কাঁটার মত খাড়া, গোফ দুটো ঝুলে পড়েছে দু'পাশে, চোখ দুটো দেহের আকারে অতি ক্ষুদ্র এবং তীব্র লালচে....বনহুর সন্দেহভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালো ম্যানেজারের দিকে। এক পলক দেখে নিয়ে উপরে উঠে গেলো সে।

কাঠের দোতলা।

ছোট্ট ছোট্ট কয়েকখানা কুঠরি। সবগুলোতে লোক আছে কিনা বোঝা গেলো না। বনহুরকে একটা কুঠরি দেখিয়ে দিয়ে বললো—যান, আপনি এই কুঠরির মধ্যে ঘুমান। এক রাত দশ টাকা দিতে হবে কিন্তু।

বনহুর বললো—আচ্ছা।

বয় চলে গেলো।

বনহুর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলো।

ছোট্ট কুঠরির মধ্যে একপাশে একটা চৌকি, চৌকির উপর সামান্য বিছানা পাতা রয়েছে আধময়লা একটা বালিশ এবং মশারীও আছে।

বনহুর কুঠরির মধ্যে প্রবেশ করে বিছানায় বসলো।

❑

গভীর রাত।

নিস্তব্ধ হোটেল। সমস্ত ফাংহা শহর যেন নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। বনহুর উঠে দাঁড়ালো, ওপাশে মুক্ত জানালা, বনহুর সেই জানালার পাশে এসে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো ঘুমন্ত নগরীর উপর। দূর থেকে লাইটপোষ্টের আলোগুলো কেমন যেন মিটমিটে লাগছে, যেন এক একটি প্রদীপ সাজিয়ে রাখা হয়েছে প্রদীপদানির উপর।

বনহুর কিছুক্ষণ স্থির নয়নে দেখলো ঘুমন্ত নগরীটা, তারপর ফিরে এলো দরজার পাশে। যেমনি সে দরজাটা খুলতে যাবে অমনি কে যেন সরে গেলো দরজার পাশ থেকে। সিঁড়িতে স্পষ্ট শোনা গেলো জুতোর শব্দ।

বনহুর দ্রুত দরজা খুলে তাকালো বাইরের দিকে। সিঁড়ির ধাপে কোনো এক লোক নিচে নেমে গেলো, তা বেশ বুঝতে পারলো সে। তবে লোকটা পুরুষ না নারী তা বোঝা গেলো না। বনহুর ভাবতে লাগলো, তবে কি কেউ তাকে দরজার ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করছিলো, লক্ষ্য করছিলো তার কার্যকলাপ?

বনহুর সেদিন এর বেশি কোনো সূত্র আবিষ্কারে সক্ষম হলো না। বিছানায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে নিদ্রায় ঢলে পড়লো।

পরদিন যখন বনহুরের ঘুম ভাঙলো তখন অনেকটা বেলা হয়ে গেছে।

হাই তুলে বিছানায় উঠে বসলো বনহুর। ওদিকে খোলা জানালা দিয়ে দৃষ্টি চলে গেলো তার নীল আকাশে, প্রথমেই মনে পড়লো হতভাগ্য আরজুর কথা। বেচারা আরজু এসেছিলো তাদের সঙ্গে তাদের কাজে সহায়তা করবে বলে, কিন্তু একদিন যেতে না যেতেই তাকে চিরতরে বিদায় নিতে হলো পৃথিবী থেকে। রহমান সেও যে উবে গেলো আরজুর সঙ্গে.......তবে কি রহমানও নিহত হয়েছে?

কিন্তু এই মুহূর্তে বসে বসে ভাববার সময় নেই। বনহুর উঠে দাঁড়ালো, তারপর চৌকির পাশে থেকে কোটটা তুলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নিচে।

নিচে নেমে আসতেই প্রথমে নজর পড়লো সরাইখানার দক্ষিণের কোণে টেবিলের পাশে চেয়ারটায়। দিনের আলোতে দেখলো এক বিদঘুটে শয়তান মুখ, চিনতে বিলম্ব হলো না বনহুরের—এই সেই সরাইখানার মালিক যাকে গত রাতে দেখেছিলো সে দু'চোখে কেমন শার্দুলের চাউনি।

বনহুর বেরিয়ে যাবার সময় টাকাটা যখন মালিকের টেবিলে রাখলো তখন তীব্র কটাক্ষে মালিক তাকালো বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর কিছু না বলে টাকাটা রেখে চলে যাচ্ছিলো, মালিক বললো—রাতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো?

বনহুর ছোট্ট একটু শব্দ করলো না। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো।

গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন তার মন। আরজুর ছিন্ন মস্তক মহুয়া তলায় চাপা দিয়ে রাখলেও তার কথা একদণ্ড ভুলতে পারছে না বনহুর, কারণ তার ফাংহা অভিযানের প্রথম শিকার হলো সে, রহমান কোথায় কে জানে— কে জানে তার ভাগ্যে কি ঘটেছে। খুনী বুঝতে পেরেছে তাদের আগমন এবং সে কারণেই খুনী তার অনুচরদ্বয়কে প্রথমেই উধাও করে তাকে জানিয়ে দিলো সে অত্যন্ত চতুর। বনহুরের চিন্তাধারা হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো, সাদর সম্ভাষণ জানালো এক মহিলা।

চমকে চোখ তুললো বনহুর। এতক্ষণ গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকায় বুঝতেই পারেনি কখন সে ডাকবাংলোর কাছাকাছি এসে পড়েছে। মহিলা তাকে সম্ভাষণ জানালো—হ্যালো মিঃ আলম!

বনহুর প্রথমে অবাক হলেও পর মুহূর্তে বুঝতে পারলো নিশ্চয়ই এই মহিলা মিঃ ইবনের পত্নী হবে, নাহলে তার নামটা জানলো কি করে। এ নাম তো সে এখানে আসার পর একমাত্র মিঃ ইবনের কাছেই বলেছিলো।

বনহুর থমকে দাঁড়িয়ে চোখ তুললো, সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলো না সে-মহিলাটাকে একেবারে বিদেশিনী বলা চলে। মাথায় বব্ কাটা চুল, মুখে প্রসাধনীর প্রলেপ, চোখে তীব্র চাউনি—বনহুর ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত লক্ষ্য করে দেখছিলো।

মহিলা হেসে বললো—আশ্চর্য হচ্ছেন, না?

বললো বনহুর—কেন?

এই ধরুন আমাকে দেখে।

না।

তবে আমি আপনার নাম কেমন করে জানলাম তাই শুনে।

তাও না, কারণ আমি জানি আপনি কে।

বলুন তো আমি কে?

আপনি মিসেস ইবন।

হাঁ, ঠিকই ধরেছেন, আসুন ভিতরে আসুন। আমি আমার স্বামীর কাছ থেকেই আপনার নাম ও বর্ণনা শুনেছি। উনি বলেছিলেন, আপনাকে দেখলে আমি নাকি অভিভূত হয়ে পড়বো। সত্যি, আপনার সৌন্দর্যের তিনি যা বর্ণনা দিয়েছিলেন, আপনি কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি..... আসুন ভিতরে আসুন।

বনহুর একবার নিজ কামরায় দিকে তাকালো। দরজায় যে তালা লাগিয়ে গিয়েছিলো সে, তেমনিই আছে। সে মিসেস ইবনের পিছনে তার কামরায় প্রবেশ করলো।

কামরায় প্রবেশ করে কিছুটা অবাক হলো, কারণ কামরার মধ্যে সামান্য কয়েকটা সরঞ্জাম ছাড়াও একটা অদ্ভুত জিনিস সে দেখতে পেলো, তা হলো একটা বড় বাঘের মূর্তি। একটা টেবিলে বিরাট একটা বাঘের মূর্তি হা করে দাঁড়িয়ে আছে। বাঘের মূর্তিটার চোখ দুটো যেন জ্বলছে।

মিসেস ইবন বনহুরকে বসার জন্য অনুরোধ জানালো।

বনহুর না বসে পারলো না, অদ্ভূত এক শক্তি যেন রয়েছে তার কণ্ঠস্বরে।

বসলো বনহুর।

মিসেস ইবন কোনো দ্বিধা না করে বনহুরের আসনের হাতলে বসে টেবিল থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে বনহুরের মুখে গুঁজে দিলো, তারপর নিজের ঠোঁটে চেপে ধরলো একটা, যেন সে ওর কত পরিচিত, এমনি ভাব দেখালো মহিলা।

মহিলা এরপর নিজেই অগ্নিসংযোগ করলো বনহুরের সিগারেটে, তারপর নিজের সিগারেট ধরালো। একমুখ ধোঁয়া ছুঁড়ে বললো মহিলা—আমার স্বামী কিন্তু মোটেই ধূমপান করেন না, তবে আমি করি। সত্যি কি বলবো, আপনাকে দেখে আমার খুব ভাল লাগছে। আমার স্বামী বড্ড সেকেলে ধরনের, শুধু পয়সা ছাড়া কিছু বোঝেন না। চামড়ার ব্যবসা করেন, মনটা ঠিক কশাইয়ের মত.....

বনহুর যেন এতক্ষণে একটা কথা বলার সুযোগ পেলো, বললো সে—আপনি ভুল বলছেন মিসেস ইবন, কারণ আপনার স্বামীর সঙ্গে যদিও আমার বেশিক্ষণ আলাপ হয়নি, তবু তাঁর কথাবার্তায় অনুভব করেছি তিনি বড় অমায়িক, মহৎ চরিত্রের ভদ্রলোক।

নো নো, আপনি যা দেখেছেন তা তাঁর আসল রূপ নয় মিঃ আলম... মহিলাটা যেন একরকম প্রায় চিৎকার করেই কথা ক'টি বললো। মুহূর্তে

গলার স্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো, ধরা গলায় বললো মহিলা—আপনি তাঁর হাসিভরা মুখ দেখে মনে করেছেন তিনি মহৎ ব্যক্তি, তাই না? কিন্তু আসলে তিনি বড় অসৎ, কারণ আমার প্রতি তাঁর কোনো ভালবাসা নেই।

বনহুরের ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠলো, এসব কথা শুনতে সে আসেনি। মহিলার ডাকে সে এসেছিলো মিঃ ইবনের সঙ্গে আলাপ করতে কিন্তু একা মহিলাই শুধু রয়েছেন তা ভাবতে পারেনি সে।

বনহুর বললো—প্রতিটি স্ত্রীই মনে করেন তাঁর স্বামী তাঁকে ঠিকমত ভালবাসেন না কিংবা তাঁর ভালবাসায় ত্রুটি আছে কিন্তু আসলে এটা ভুল মিসেস ইবন। যাক সে সব কথা, এখন উঠি, কারণ রাতে আমি বাংলোয় ছিলাম না।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো মিসেস ইবন—বলেন কি, রাতে আপনি ডাকবাংলোয় ছিলেন না?

না।

কেন, কেন আপনি ডাকবাংলো ছেড়ে গিয়েছিলেন?

ক্ষুধার তাড়নায়।

তার মানে?

মানে সরাইখানায় ক্ষুধা নিবারণ করতে গিয়েছিলাম, রাত বেশি হওয়ায় সেখানেই ছিলাম।

ও বুঝেছি, নতুন এসেছেন কিনা, পথ চলতে ভয় পান।

উঠি মিসেস ইবন?

আবার আসছেন তো? আমি কিন্তু চুপচাপ থাকার মেয়ে নই, আপনাকে সময়ে অসময়ে বিরক্ত করবো। এজন্য আগে থেকেই বলে রাখছি কিন্তু......

হেসে উঠে দাঁড়ালো বনহুর, ছোট করে বললো— বেশ, তাই করবেন।

বনহুর বেরিয়ে গেলো।

❑

বনহুর তার ঘরের দরজা খুলতেই নজর পড়লো মেঝেতে একটা চিঠি পড়ে আছে, ঠিক পায়ের কাছে। বনহুর উবু হয়ে চিঠিখানা তুলে নিলো, তারপর ছিঁড়ে নিয়ে পড়তে শুরু করলো, চিঠিতে লেখা আছে—

মহাত্মন,

যে উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি ফাংহায় এসেছেন তা কোনোদিনই সফল হবে না। প্রথম দিনই বুঝতে পেরেছেন এবং অনুভব করেছেন। আপনার বিশ্বস্ত চাকর আরজু তার নিজের মাথাটা আপনাকে উপহার দিয়ে তার প্রমাণ দিয়ে গেছে। আপনার সহচর রহমান এখন কোথায় তাও জানেন না, কিন্তু অচিরেই জানতে পারবেন তার পরিণতির কথা। তারপর শুরু হবে আপনার সঙ্গে মোকাবেলা।

—টাইগার

বনহুর একবার নয়, দু'তিনবার চিঠিখানা পড়লো। তার জীবনে এমন মুহূর্ত আজ নতুন নয়, বহুবার এসেছে। তবু আজ কেমন যেন লাগলো—আরজুর কচি মুখখানা ভেসে উঠলো বনহুরের চোখের সামনে, সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে উঠলো তার মুখমণ্ডল, অসহায় আরজুকে যে হত্যা করেছে তার প্রতিশোধ সে নেবেই। হঠাৎ আপন মনে হেসে উঠলো বনহুর, তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বললো—খুনী, তুমি যেখানেই আত্মগোপন করে থাকো না কেন, আমি তোমাকে খুঁজে বের করবোই...

কার সঙ্গে কথা বলছেন? কাউকে তো দেখছি না মিঃ আলম? কথাগুলো বলতে বলতে কক্ষে প্রবেশ করলেন মিঃ ইবন।

বনহুর চিঠিখানা পকেটে রেখে ফিরে তাকালো। মিঃ ইবন একমুখ হাসি হেসে বললেন—অসময়ে এলাম কিছু মনে করেননি তো? বাইরে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে শুনলাম আপনি আমার কক্ষে পদার্পণ করেছিলেন, পরম সৌভাগ্য আমার!

এ আর এমন কি! বললো বনহুর এবং আলগোছে চিঠিখানা লুকিয়ে ফেললো সে জামার পকেটে। মিঃ ইবনের কথাগুলো তাকে খুশি না করে বিরক্তই করলো। তবু বিরক্তিভাব মুখে না টেনে বললো —বসুন, আপনার কথাই ভাবছিলাম।

মিঃ ইবন বলে উঠলেন—আমার কথা না আমার স্ত্রীর কথা? আপনি যতই ঢাকতে চেষ্টা করুন না কেন, আপনি আমার স্ত্রীর কথাই ভাবছিলেন এখন আমি তা হলফ্ করে বলতে পারি কারণ আমার স্ত্রীর মুখে যা শুনলাম তা অতি সহজ—এসে আপনার সৌন্দর্যে মুগ্ধই শুধু হয়নি, একেবারে ভালবেসে ফেলেছে আপনাকে।

কোনো স্ত্রীর স্বামী যে এমন করে বলতে পারে এই যেন প্রথম শুনলো বনহুর। বিরক্তি বোধ করলেও মুখোভাব প্রসন্ন রেখে বললো—মিসেস ইবনের সঙ্গে আমার বেশিক্ষণের পরিচয় নয়....

তবু সে আপনার ব্যবহারে মুগ্ধ, অভিভূত মিঃ আলম। আমি প্রথমেই বলেছিলাম না আমার স্ত্রী আপনাকে দেখলে মুগ্ধ হবে। একটু থেমে বললেন—সে বড় রিক্তা, বড় ব্যথিতা—জানেন মিঃ আলম, আমার ভালবাসায় সে তৃপ্ত নয়।

বনহুর অবাক হয়ে তাকালো মিঃ ইবনের মুখের দিকে।

ইবন তখনও বলে চলেছেন—আমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে সুখী হতে পারেনি বেচারী। সব সময় কেমন উচ্ছৃঙ্খল মনে হয় ওকে। কেমন যেন এড়িয়ে চলতে চায় আমাকে সে। কথাগুলো বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন মিঃ ইবন।

বনহুর মিঃ ইবনকে একটা সোফায় বসার জন্য অনুরোধ জানিয়ে নিজে বসে পড়লো, তারপর বললো সে—বলুন?

হাঁ, কিছু কথা বলবো বলেই এসেছি মিঃ আলম। কথাটা বলে মিঃ ইবন আসন গ্রহণ করলেন।

বনহুর সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো, তারপর একমুখ ধুঁয়া উপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তাকালো মিঃ ইবনের দিকে, ভাবলো লোকটা পাগল না মাতাল, এ কেমন লোক নিজের স্ত্রীর বিষয় নিয়ে এমন ধরনের আলাপ করে? যেমন স্বামী তেমনি অদ্ভুত মহিলা তাঁর স্ত্রী।

বনহুরের চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন করে বললেন মিঃ ইবন—বিয়ে হয়েছে আমাদের দশ বছর হলো কিন্তু দশ দিনও আমরা শান্তিতে সংসার করিনি।

এবার বনহুরের সহ্যের সীমা অতিক্রম হলো এতক্ষণ নিশ্চুপ শুনে গেলেও আর পারলো না সে, উঠে দাঁড়িয়ে বললো—আপনি এক্ষুণি বাইরে থেকে ক্লান্ত অবস্থায় ফিরে এসেছেন, বিশ্রামের প্রয়োজন।

হাঁ, ঠিক বলেছেন মিঃ আলম, আমি এক্ষুণি বাইরে থেকে ফিরে এসেছি, বড় ক্লান্ত.... সেই সকাল থেকে এই দ্বিপ্রহর পর্যন্ত একটানা বনে বনে ঘুরেছি।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো বনহুর—বনে বনে ঘুরেছেন মানে? আপনি তো আর কাঠের ব্যবসা করেন না যে বনে বনে ঘুরবেন? আপনি কি জন্যে....

হাঁ, আমি চামড়ার ব্যবসা করি এবং সে কারণেই আমি বনে গিয়েছিলাম জীবজন্তুর সন্ধানে।

জীবজন্তুর সন্ধানে?

হাঁ, আপনি যেমন কাঠের সন্ধানে বনে যান, আমিও ঠিক তেমনি....

ঢোক গিলে বললো বনহুর—ঠিক বলছেন। আপনিও তাহলে আমারই মত বনে বনে চামড়ার সন্ধান করেন?

করি মানে না করে কোনো উপায় নেই। দেখছেন না এত টাকা-পয়সা উপার্জন করেও আমার স্ত্রীকে সুখী করতে পারিনি...

দেখুন মিঃ ইবন, আপনিও ক্লান্ত আমিও ক্লান্ত, তাই বলছিলাম কি...

ও আপনিও বুঝি কাঠের সন্ধানে বাইরে গিয়েছিলেন?

হাঁ, না গিয়ে কি উপায় আছে, গিয়েছিলাম কিন্তু পাইনি তবে পাবো বলে আশা করছি। কিন্তু আপনার যা বলবার আছে আমি পরে মনোযোগ সহকারে শুনবো, এখন যদি আপনি...

ও যাচ্ছি... বেশ বেশ, আপনিই না হয় সময় করে নিয়ে আসবেন। এখন যাই কেমন?

আচ্ছা আসুন।

মিঃ ইবন বেরিয়ে গেলেন।

বনহুর যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। মুক্ত জানালা দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো মহুয়া তলায়, যেখানে বেচারা আরজুর মাথাটা পুঁতে রাখা হয়েছে। হঠাৎ বনহুরের চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো, আংগুলের অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা নিক্ষেপ করলো মেঝের একপাশে—ভুলে গেলো বনহুর টেবিলে রাখা এ্যাসট্রের কথা।

বড় একা লাগছে আজ বনহুরের, যদিও সে ইচ্ছা করেই মিঃ ইবনকে বিদায় করে দিয়েছেন একটু পূর্বে—একা একা চিন্তার সুযোগ পাবে বলে।

বনহুর ভাবছে সেই সরাইখানার মালিকটার কথা, একটা নর শয়তানের মুখ সে দেখতে পেয়েছে। সরাইখানা থেকেই বয় এসে খাবার রেখে যাবার অভিনয় করে রেখে গেছে নরমুণ্ড, বেচারী আরজুর ছিন্নমস্তক। আরজু আর রহমান গিয়েছিলো সরাইখানায় তার জন্য খাবার আনতে কিন্তু খাবার আনা তাদের হয়নি, হয়েছে চরম শাস্তি। তবে কি ফাংহার হত্যাকাণ্ড এই সরাইখানা থেকেই সংঘটিত হয়ে চলেছে.....

বনহুরের ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠে।

এমন সময় দরজায় ছায়ামূর্তির মত কাউকে দেখা যায়, ফিরে তাকাতেই অবাক হয় বনহুর, সেই বিদঘুটে মুখ, সরাইখানার মালিক। বনহুর ফিরে তাকাতেই মালিক ভারী গলায় সম্বোধন জানিয়ে বললো—আপনি ভুল করে আমাকে একশত টাকার নোট দিয়ে এসেছেন। আমি তখন ভালভাবে লক্ষ্য না করেই ভাঁজকরা নোটখানা ক্যাশবাক্সে রাখি, তারপর যখন পুনরায় ক্যাশবাক্স খুলি, তখন দেখতে পাই সেটা দশ টাকার নোট নয়, একশত টাকার নোট সেটা, তাই ছুটে এলাম দিতে।

বনহুরের সম্মুখে একশত টাকার নোট সহ হাতখানা বাড়িয়ে ধরে সরাইখানার মালিক।

বনহুরের দু'চোখে বিস্ময়, সে ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত লক্ষ্য করে একটু হেসে ধন্যবাদ জানিয়ে টাকাটা হাতে তুলে নিলো, তারপর পকেট থেকে দশ টাকার একখানা নোট বের করে সরাইখানার মালিকের হাতে দিলো।

সরাইখানার মালিক মুহূর্ত বিলম্ব না করে বিদায় গ্রহণ করলো, যাবার সময় একটা কথাও সে বললো না তবে তীব্র কটাক্ষে একবার দেখে নিলো বনহুরের মুখখানা।

বনহুর আরেকটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বাংলোর বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। আশ্চর্য, লোকটা যেন হাওয়ায় উবে গেছে। এইমাত্র সে ডাকবাংলো থেকে বেরিয়ে এলো, শুধু একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করতে যে সময়টুকু লেগেছে তারই মধ্যে লোকটা চলে গেলো এতটা পথ! বনহুর ভালোভাবে তাকাতেই দেখতে পেলো, সরাইখানার মালিক সবেমাত্র ডাকবাংলোর পিছন থেকে সম্মুখভাগে এগিয়ে আসছে। আড়চোখে একবার বনহুরকে দেখে নিলো, তারপর দ্রুত পা বাড়ালো সরাইখানার দিকে।

বনহুরের মনে আরও বেশি করে সন্দেহ দানা-বাঁধলো, তবে কি লোকটা তার কক্ষে পিছন দিকে আত্মগোপন করে এতক্ষণ তাকে লক্ষ্য করছিলো? নিশ্চয়ই তাই হবে। বনহুর ফিরে এলো কক্ষমধ্যে।

পকেট থেকে বের করলো চিঠিখানা, আবার পড়লো সে মনোযোগ দিয়ে, তারপর অট্টহাসি হেসে উঠলো।

হয়তো সেই হাসির শব্দ পাশের কক্ষে গিয়ে পৌঁছেছিলো। ছুটে এলেন ইবন—তাঁর সঙ্গে এক ভদ্রলোক, ওরা এসে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শব্দ করলেন।

মিঃ ইবন বললেন—ভিতরে আসতে পারি?

বনহুরের হাসি তখন থেমে গেছে, চোখেমুখে ফুটে উঠলো ক্রুদ্ধভাব। মিঃ ইবনের কথায় কোনো জবাব না দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে, গম্ভীর গলায় বললো—হঠাৎ কি মনে করে? পরমুহূর্তে সঙ্গের ভদ্রলোকটার মুখে নজর পড়তেই অবাক হয়ে তাকালো বনহুর।

মিঃ ইবন বললেন—ইনি আমার শ্যালক মিঃ আর্ম। এলাম আপনার হাসির শব্দ শুনে, একা একা বড় হাসছিলেন যে? তাছাড়া আপনাকে একা একা কথা বলতেও শুনেছি, আপনি কি কোনো ভৌতিক সাধনা করেন?

বলতে ভুলেই গেছি মিঃ ইবন। হাতের মধ্যে হাত কচলে বললো বনহুর—দেখুন, আপনি যখন জানতেই পেরেছেন তখন না বলে পারছি না, আমি ভৌতিক সাধনা করি।

চমৎকার! তবে...... বলে একটু ভাবলেন মিঃ ইবন, তারপর বললেন—আমার স্ত্রী কিন্তু ভৌতিক সাধনাকে বড় ভয় করে। যদি জানতে পারে আপনি ভৌতিক সাধনা করেন তাহলে হয়েছে, সে আপনার ছায়াও মাড়াবে না।

তাই নাকি? বলে হাসলো বনহুর।

মিঃ ইবন বললেন—আমার শ্যালক বোনের খুব ভক্ত। সব সময় বোন বোন করে পাগল, একদণ্ড ওরা কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে চায় না। জানেন মিঃ আলম ওর সখ কি? ওর সখ হিংস্র জীবজন্তুর সন্ধান করা। তাই ভাই-বোন মিলে সমস্ত দিন বনে বনে ঘুরে বেড়ায়.....

হিংস্র জীবজন্তুর সন্ধান, কেমন?

ঠিক তাই। বললেন মিঃ ইবন।

বনহুর তাকালো মিঃ আর্মের মুখের দিকে। ভাবগম্ভীর শান্ত ভদ্রলোক, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। বোনের বয়সের চেয়ে বড়তো বটেই তবে বেশ বড় বলে মনে হলো। মাথার চুলে টাক পড়েছে, চোখের চাউনি তীব্র-তীক্ষ্ণ, সুচতুর ব্যক্তি বলে মনে হলো। মিসেস ইবনের বয়স ভাইয়ের চেয়ে কম পক্ষে দশ বছর কম হবে।

এতক্ষণ মিঃ আর্ম একটি কথাও বলেননি, এবার তিনি বললেন—হিংস্র জীবজন্তুর নেশা আমার নয়, বোন এ্যামের।

এতক্ষণে মিঃ ইবনের বোনের নাম জানতে পারলো বনহুর—মিসেস ইবনের নাম তাহলে মিসেস এ্যাম। আপন মনেই দু'একবার নামটা স্মরণ

করে নিলো সে। বসতে বলার সাহস হলো না বনহুরের---একবার বসলে হয়তো উঠতেই চাইবে না, অযথা সময় নষ্ট হবে।

ভাগ্য ভাল বলতে হবে, ওরা যেভাবে এসেছিলো ঐ ভাবে চলে গেলো। বনহুর যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে বিছানায় দেহটা এলিয়ে দিলো। রহমান কোথায়, এখন সে কি অবস্থায় আছে কে জানে।

এরপর থেকে শুরু হলো বনহুরের হত্যারহস্য অভিযানের সঙ্গে রহমানের সন্ধান অভিযান।

বনহুর যখন এসব নিয়ে ভাবছে তখন ফাংহার এক গুপ্তকক্ষে একটা আলোকস্তম্ভের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন পুরুষ। সবার মুখেই মুখোস, পায়ে ভারী বুট সবাই তাকিয়ে আছে সম্মুখে।

ধীরে ধীরে কক্ষ অন্ধকার হলো।

আলোকস্তম্ভের আলো স্তিমিত হলো, স্তম্ভের ভিতরে ভেসে উঠলো একটা ছায়ামূর্তি। ছায়ামূর্তি নারী কি পুরুষ বোঝা যাচ্ছে না, শুধু একটা মানুষের মূর্তি বলেই বোঝা যাচ্ছে।

তিনজন ব্যক্তি উম্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছে, তার কোনো নির্দেশের অপেক্ষা করছে যেন।

ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠলো, একটা অদ্ভুত শব্দ বেরিয়ে এলো আলোকস্তম্ভের ভিতর থেকে, কোনো আদেশ বলেই মনে হলো।

একবার দু'বার তিনবার।

দু'জন লোক একটা যুবককে চোখবাঁধা অবস্থায় নিয়ে এলো সেই কক্ষে।

যুবকের পিছন হাত দু'খানা বাঁধা, চুলগুলো রুক্ষ, মুখ শুকনো। যুবককে কক্ষমধ্যে নিয়ে আসার পর তার চোখের বাঁধন খোলা হলো, দু'জন লোক ওকে ধরে রাখলো মজবুত করে।

যুবক ভয়ার্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকালো সম্মুখে, আলোকস্তম্ভের ভিতরে অদ্ভুত এবং ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে শিউরে উঠলো সে, চোখেমুখে ফুটে উঠলো একটা ভয়বিহবল ভাব, বললো সে—আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে এসেছো?

যে দু'জন লোক যুবকটিকে ধরে নিয়ে এসেছিলো, তারা বললো—তোমার আকাঙ্ক্ষিত স্থানে। তুমি না বলেছো চিরশান্তি চাও?

হাঁ, আমি শান্তি চাই, আমি শান্তি চাই। আমার জীবন বড় ব্যথার, বড় দুঃখের.....

তাই তো তোমাকে আমরা এনেছি, চিরশান্তি চিরতৃপ্তির সাগরে ডুবিয়ে দেবো।

আলোকস্তম্ভের মধ্যে শোনা গেলো অদ্ভুত হাসির শব্দ। ততক্ষণে যুবকটাকে এনে ওরা দু'জন বসিয়ে দিয়েছে একটা চেয়ারে।

তিনজন মুখোশধারী তখন সজাগ হয়ে উঠেছে, তারা হাতে গ্লাবস্ পরে নিচ্ছে দ্রুত। মুখের মুখোশগুলো তাদের অদ্ভুত ধরনের—কতকটা ডুবুরিদের মত দেখতে।

ওরা তিনজন একটা টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

একজন একটা সিরিঞ্জে কিছু ওষুধ ভরে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

দু'জন যুবকটাকে এবার ধরে জোরপূর্বক শুইয়ে দিলো টেবিলের উপর।

যুবকটা চিৎকার করে উঠলো—না না, আমি শান্তি চাই না। আমাকে তোমরা রেখে এসো, যেখানে ছিলাম সেখানেই রেখে এসো...

ততক্ষণে তৃতীয় ব্যক্তি তার হাতের সিরিঞ্জের ওষুধ পুশ্ করে দিয়েছে যুবকের দেহে।

যুবক মুহূর্তে নীরব হয়ে গেলো, টু শব্দ আর বের হলো না তার মুখ দিয়ে।

এবার আলোকস্তম্ভের মধ্য থেকে শব্দ হলো—ডক্টর, বৈজ্ঞানিক, সার্জন—আপনারা তিনজনই মহৎ ব্যক্তি। আমাদের উদ্দেশ্য অসৎ বা দোষণীয় নয়, যদিও আমরা প্রতি রাতে একটা করে নরহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছি..... এবার আপনারা ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে কাজ সমাধা করুন।

আলোকস্তম্ভের মধ্যে মূর্তিটা ধীরে ধীরে নিচে নেমে যাচ্ছে বলে মনে হলো।

এদিকে ডক্টর, বৈজ্ঞানিক, সার্জন এরা তিনজন দ্রুত তাদের কাজ সমাধান করে ফেললো।

টেবিলে পড়ে রইলো একটা অসহায় যুবকের প্রাণহীন দেহ।

ডক্টর, বৈজ্ঞানিক ও সার্জন কাজ সমাধা করে সরে গেলো পাশের কামরায়। সে কামরায় রয়েছে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি।

একটা মাঝারি ধরনের পাত্র থেকে বের করলো সার্জন একটা রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ড, তারপর সেটা বৈজ্ঞানিকের সম্মুখে তুলে ধরলো, তখনও হৃৎপিণ্ডটা কেমন থরথর করে কাঁপছিলো।

ডক্টর হাতের গ্লাবস্ খুলে ফেলতে ফেলতে বললো—দ্রুঁত অক্সিজেন পাত্রে ভরে রাখুন।

একটা পাত্র সম্মুখে ছিলো, তার মধ্যে ছিলো তরল পদার্থ। সার্জন হৃৎপিণ্ডটা তুলে নিয়ে সেই পাত্রমধ্যে ছেড়ে দিলো, তারপর একটা লম্বা যন্ত্রের দ্বারা হৃৎপিণ্ডটা তুলে নিয়ে অক্সিজেন বাক্সে ভরে ফেললো। তারপর চললো বৈজ্ঞানিক সাধনা, তিনজন মিলে নানাভাবে হৃৎপিণ্ডটার উপর পরীক্ষা চালালো।

পরদিন দেখা গেলো রাজপথে পড়ে আছে একটা যুবকের মৃতদেহ।

ফাংহা পুলিশমহলে আলোড়ন শুরু হলো। আজও আবার হত্যাকাণ্ড, এক অসহায় যুবকের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেলো।

পুলিশমহল লাশ সনাক্ত করার জন্য নিয়ে এলো পুলিশ অফিসে কিন্তু কেউ যুবকটাকে সনাক্ত করতে সক্ষম হলো না। যুবকের পরিচয় কেউ জানে না— কে এই যুবক এবং কোথা থেকে সে ফাংহায় এসেছিলো। লাশ পরীক্ষা করে দেখা গেলো তার বুকের একপাশে একটা বিরাট অপারেশনের দাগ। সূক্ষ্মভাবে সুতীক্ষ্ণধার অস্ত্রের দ্বারা যুবকের বুক চিরে ফেলা হয়েছে এবং তার হৃৎপিণ্ডটা যত্নসহকারে বের করে নেওয়া হয়েছে।

যুবকের দেহে আর কোনো স্থানে ক্ষতচিহ্ন নেই

লাশ পোস্টমর্টেম করার জন্য মর্গে পাঠানো হলো।

যখন লাশটা নিয়ে পুলিশমহল গবেষণা করে চলেছে তখন একটা পাগল ভিড় ঠেলে প্রবেশ করলো সেখানে। লাশটা সে পরীক্ষা করে দেখে বিড়বিড় করে কিছু বললো—তারপর বেরিয়ে গেলো নিঃশব্দে।

❑

এক সপ্তাহ কেটে গেলো, সমস্ত ফাংহা শহর চষে ফিরলো বনহুর— কখনও দিনের আলোয়, কখনও বা রাতের অন্ধকারে। সরাইখানাতে সে প্রতিদিন কমপক্ষে দু'বার যেতো খাবার উদ্দেশ্যে। এ ছাড়াও সে ঐ সরাইখানায় যেতো রাতের অন্ধকারে যখন সমস্ত পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়তো আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে তখন ছদ্মবেশে—কোনোদিন ভিখারীর বেশে, কোনোদিন সন্ন্যাসির রূপ ধরে, কোনোদিন অন্ধ হয়ে।

সরাইখানার মালিক ইমরান খাঁকে লক্ষ্য করতো বনহুর নানাভাবে। লোকটার চালচলন শুধু সন্দেহজনকই নয়, কেমন যেন বিদঘুটে। অবশ্য বনহুরের সঙ্গে সে অত্যন্ত সৎভাব পোষণ করে চলতো। তবে কোনো ভিখারী বা দুঃস্থ লোককে সে দেখতেই পারতো না। বনহুর যখন অন্ধ বা ভিখারীর বেশে যেতো, তখন ক্রুদ্ধ হয়ে গালাগালি করতো ইমরান খাঁ, যা তার মুখে আসতো তাই বলে। এমনকি গালমন্দের সঙ্গে গলা ধাক্কাও দিয়েছে ক'দিন। বনহুর তবু নাছোড়বান্দা রাত্রে একটু আশ্রয় তার চাইই। হয়তো সরাইখানার বারান্দায় অথবা দোতলার বেলকুনিতে কিংবা রান্নাবান্নার চত্বরে।

গভীর রাতে সরাইখানা যখন নিঝুম নিস্পন্দ, তখন বনহুর অন্ধকারে আত্মগোপন করে সন্ধান করতো। এমনি একদিন—বনহুর সেদিন একখানা চৌকির উপর কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়েছিলো। বাইরে ঝুপঝাপ বৃষ্টি হচ্ছে। হঠাৎ বনহুরের মনে হলো কেউ যেন তার শিয়রে এসে দাঁড়ালো।

কম্বলের তলা থেকে চোখ মেললো বনহুর, সে স্পষ্ট দেখতে পেলো তার শিয়রে দাঁড়িয়ে সরাইখানার মালিক। কেমন যেন কট্‌মট্ করে তাকিয়ে আছে সে, বনহুর একটু নড়ে উঠতেই মালিক দ্রুত সরে গেলো।

বনহুরের মনে সন্দেহের দোলা আরও গভীর হলো, ম্যানেজারটা তাহলে তাকে চিনতে পেরেছে। বনহুরের মনে পড়লো সেই চিঠিখানার কথা। খুনী তার আগমন উদ্দেশ্য জানতে পেরেছে এবং তাকে সব সময় অনুসরণ করে চলেছে—লক্ষ্য করে চলেছে তার কার্যকলাপ—চিঠিখানাই হলো তার প্রমাণ। সে যে ভিখারীর বেশে সরাইখানায় এসেছে তাও বুঝতে বাকি নেই খুনীর। খুনী অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আরজুর মাথাটা যে মহুয়া তলায় চাপা দিয়ে রেখেছে সে তাও খুনীর অজানা নেই, কিন্তু কে সে খুনী.....

এক সময় সবার অলক্ষ্যে ফিরে এলো বনহুর ডাকবাংলোয়।

তালা খুলে কক্ষে প্রবেশ করে একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিলো সে। ললাটে ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম, একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করতেই পদশব্দ শোনা গেলো বারান্দায়।

বনহুর ফিরে না তাকিয়ে ভালোভাবে ইজিচেয়ারে হেলান দিলো, তারপর প্রতীক্ষা করতে লাগলো সে কারুর।

মাত্র কয়েক মিনিট।

পিছনে এসে দাঁড়ালো কেউ।

একটা কোমল কণ্ঠস্বর কানে এলো তার—মিঃ আলম, আপনাকে মোটেই পাই না, কোথায় থাকেন বলুন তো?

সোজা হয়ে বসলো বনহুর, তারপর হেসে বললো—কাজ নিয়ে বাইরে যেতে হয়, তাই....

কিন্তু এমনভাবে সারাটা দিন কাজ করা কি উচিত—নিশ্চয়ই কাঠের সন্ধানে যান?

হাঁ, আপনার অনুমান সত্য মিসেস ইবন।

দেখুন, আপনি এতক্ষণ আমাকে বসতে বলেননি কিন্তু?

ওঃ মনে নেই-বড় ভোলা আমি কিনা তাই, বসুন মিসেস ইবন।

মিসেস ইবন বসে পড়লো এবং শান্তকণ্ঠে বললো—আমাকে মিসেস ইবন না বলে মিসেস এ্যাম বলেই ডাকবেন।

আচ্ছা তাই ডাকবো।

দেখুন, প্রতিদিন আমি তিনবার আপনার খোঁজে এসেছি। যখনই এসেছি তখনই দেখেছি দরজায় তালা বন্ধ। আমার ভাই মিঃ আর্ম আপনার অনেক সুনাম করলেন।

বললো বনহুর—তাই নাকি?

হাঁ, ভাইয়া আর্মের বড় পছন্দ হয়েছে আপনাকে, আমি নিজেও আপনার একজন বিশেষ....

বনহুর ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সিগারেট কেসটা এগিয়ে ধরে বলে—নিন।

মিসেস ইবন খুশি হয়ে একটা সিগারেট তুলে নেয় হাতে,—তারপর ঠোঁটে গুঁজে মুখখানা বাড়িয়ে ধরে বনহুরের সামনে।

বনহুর ম্যাচ জ্বেলে ওর সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দেয়, তারপর বলে—মিঃ ইবন বুঝি, চামড়ার সন্ধানে গেছেন?

হাঁ, তিনি সব সময় কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, কোনো সময় আমার মন নিয়ে চিন্তা করেন না, এমন কি তিনি সিগারেট পান করার সময়টুকু পান না। ভাগ্যি আমার ভাই মিঃ আর্ম আমার সঙ্গে থাকেন, তাই আমি আমার সাধনা চালিয়ে যেতে.....

সাধনা! আপনি কোনো সাধনা করেন নাকি?

সাধনা মানে, আপনি যেমন ভূতের সাধনা করেন, আমি তেমনি .....কথা শেষ না করেই হাসে মিসেস ইবন।

আমি ভূতের সাধনা করি, একথা আপনি কেমন করে জানলেন মিসেস এ্যাম?

আমার স্বামী এবং ভাইয়ের মুখে শুনেছি। তবে যেদিন প্রথম আপনাকে দেখেছি সেদিনই কিছুটা আঁচ করে নিতে পেরেছিলাম আপনি সাধারণ লোক নন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ মিঃ আলম, বিশ্বাস করুন আপনাকে দেখার পর থেকে আমার মনে বারবার একটা প্রশ্ন জেগেছে—আপনি সাধারণ মানুষ নন.....

আপনার মনে এ ধরনের ধারণা হওয়ার কারণ কি মিসেস এ্যাম?

আমি নিজেই জানি না। আপনাকে দেখার পর আমার মনে হয়েছে আপনি আমার অনেক পরিচিত—বড় আপনজন.... জানেন মিঃ আলম, আমি বড় অসহায়, বড় নিঃস্ব...... এ পৃথিবীতে আমার কেউ নেই, কিছু নেই—একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো মিসেস ইবনের বুক চিরে।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো মিসেস ইবনের মুখমণ্ডল করুণ ব্যথা কাতর হয়ে উঠেছে। তার আংগুলের ফাঁকে সিগারেটটা জ্বলে নিঃশেষ হয়ে আসছে।

বনহুর বললো—আপনার স্বামী আমাকে সব বলেছেন। বলেছেন আপনাকে তিনি কিছুই দিতে পারেননি....

হাঁ, তিনি সেজন্য দুঃখিত ও অনুতপ্ত বটে, কিন্তু.....

বলুন?

না থাক, আজ আর বেশি জানতে চাইবেন না। আমার ভাইয়া মিঃ আর্মের সঙ্গে আলাপ করলে অনেক কিছু জানতে পারবেন। একটু থেমে বললো মিসেস ইবন—পাশের কামরাতেই থাকেন অথচ আপনি বড় দূরে থাকেন। সময় অসময়ে পাশে বসে দুটো গল্পসল্প করবো তাও হয় না। আসুননা মিঃ আলম, আমার কামরায় কেউ নেই, বসে বসে গল্পসল্প করা যাবে। ভাইয়াও বেরিয়ে গেছেন....

বনহুর বললো—আমি এখন বড় ক্লান্ত, একটু বিশ্রাম করতে চাই।

মিসেস ইবনের মুখমণ্ডল ম্লান বিমর্ষ হলো, সে উঠে দাঁড়ালো এবং কোনো কথা না বলে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর কোনো কথা বললো না, বরং সে মনে মনে খুশি হলো। অসময়ে বিরক্তি বোধ হচ্ছিলো তার।

মিসেস ইবন চলে যেতেই বনহুর উঠে দাঁড়ালো। যেমনি সে বাথরুমের দিকে পা বাড়াতে যাবে, অমনি তার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো যে আসনে মিসেস

ইবন বসেছিলো সেই আসনে! দেখলো একটা ছোট্ট হাত ব্যাগ পড়ে আছে আসনের উপরে।

বনহুরের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো, সে বুঝতে পারলো মিসেস ইবন ইচ্ছা করেই তার হাতব্যাগটা ছেড়ে গেছে। সে মনে করেছে মিঃ আলম তার হাতব্যাগটা দেখলে নিশ্চয়ই সেটা ফেরত দেবার জন্য পাশের কামরায় যাবে।

বনহুর ইচ্ছা করেই ব্যাগটা হাতে তুলে না নিয়ে বাথরুমে প্রবেশ করলো, তারপর বাথরুম থেকে বেরিয়ে হাতমুখ তোয়ালে দিয়ে মুছে নিয়ে দুগ্ধফেনিল শুভ্র বিছানায় দেহটা এলিয়ে দিলো।

নিঝুম দুপুর।

সমস্ত অঞ্চলটা খাঁ খাঁ করছে।

পথে লোকজন নেই বললেই চলে। ডাকবাংলোর পাশে শুধু ছোটবড় টিলা আর অসমতল জায়গা। মাঝে মাঝে অজানা গাছপালার ঝোপঝাড়। একটা সরু পথ আঁকাবাঁকা হয়ে উঠে এসেছে ডাকবাংলোর দিকে।

একটা পথ ডাকবাংলোর অদূর দিয়ে চলে গেছে সরাইখানার দিকে। সেই পথখানা শুধু সরাইখানাতেই শেষ হয়নি, সরাইখানা হয়ে চলে গেছে দূরে অনেক দূরে ফাংহা শহরের দিকে।

শহর ছেড়ে বেশ দূরে এই ডাকবাংলো। যেসব ভদ্রলোক বনাঞ্চলের কাজকর্ম নিয়ে আসেন তারাই আশ্রয় নেন এই বাংলোয়। এছাড়া যাদের শিকারের নেশা আছে তারাও এসে মাঝেসাঝে ভিড় জমান এই নির্জন ডাকবাংলো।

সাধারণ পথচারীরা বড় একটা এদিকে আসে না, ডাকবাংলোয় যারা থাকেন তারা সরাইখানায় গিয়ে ভোজন করে আসেন কিংবা বয় পাঠিয়ে খাবার অর্ডার দেন। খাবার দিয়ে যায় সরাইখানার লোক।

ডাকবাংলোর চৌকিদার বিহাগী বৃদ্ধ, সে দিনে কোনোরকমে কাজকর্ম কিছু কিছু করে, রাতে সে সম্পূর্ণ অক্ষম, তাই সে ডাকবাংলোয় বড় একটা আসে না।

বিহাগী এখন অত্যন্ত অসুস্থ, তাই সে ডাকবাংলোয় আসে না, মাঝে মাঝে ওর মেয়ে ঝুমা এসে ডাকবাংলো পরিষ্কার করে যায়। ঝুমা ক'দিন আসেনি—তার বাবার অসুখ আরও বেড়ে গেছে, ঝুমাকে সদাসর্বদা বাবার পাশে থাকতে হয়।

সেদিন বনহুর দ্বিপ্রহরে কক্ষে বসে বসে হাঁপিয়ে উঠেছিলো, তাই সে আলগোছে বেরিয়ে এলো ডাকবাংলোর বাইরে। হাতে তার বন্দুক, কোনো শিকার পেলে শিকার করবে সে। ডাকবাংলোর কিছু দূরে কিছুটা হাল্কা বন, নানারকম পাখি আছে এ বনে। বনের ওপাশে ছোট্ট একটা পাথুরে নদী। সরু নদীর বুক বেয়ে চলেছে সচ্ছ জলধারা, নদীর জলে সাদা সাদা পাথরের নুড়িগুলো বড় সুন্দর লাগে।

বনহুর বন্দুক হাতে এসে দাঁড়ালো একটা টিলার উপর। আশেপাশে হাল্কা বন, নানা ধরণের গাছপালা রয়েছে বনে। গাছের ডালে ডালে নানা ধরনের পাখি।

শিকার করা নেশা বা পেশা নয়। কঠিনপ্রাণ বনহুর যত নিষ্ঠুরই হোক শিকার করা সে পছন্দ করে না। তবু আজ সে বন্দুক হাতে শিকারের আশায় এসেছে বনের ধারে।

একটা টিলার উপর দাঁড়িয়ে যখন বনহুর সম্মুখে লক্ষ্য করলো তখন হঠাৎ তার নজরে পড়লো একটা মাঝারি ধরনের গাছের ডালে বসে আছে একটা পাখি। বনহুর পাখিটাকে লক্ষ্য করে বন্দুক উঁচু করে ধরলো, যেমন সে গুলী ছুড়বে অমনি কে যেন তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো—মারিস্ না বাবু!

চমকে ফিরে তাকালো বনহুর, একটা সাঁওতাল মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তার পিছনে। ঠিক জংলীরাণীর মত—ডাগর ডাগর দু'টি চোখে রাজ্যের মিনতিভরা।

বনহুর বন্দুক নামিয়ে নিলো।

মেয়েটা ছুটে পালাতে যাচ্ছিলো।

বনহুর বললো—এই শোন!

থমকে দাঁড়ালো মেয়েটা, ডাগর ডাগর চোখ দুটো মেলে তাকালো সে বনহুরের দিকে।

বনহুর বললো—কে তুমি? কি নাম তোমার?

মেয়েটা বললো—আমি এই ডাকবাংলোর চৌকিদারের মেয়ে। আমার নাম ঝুমা....বলেই সে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো—ঐ যে আমার ঘর। ওখানে আমার বাবু থাকে। জানিস বাবু, আমার বাবুর খুব অসুখ।

বনহুর ওর ব্যথাভরা কথায় ব্যথিত হলো, সে কোনো জবাব দিলো না, শুধু নীরবে তাকালো দূরে বস্তিখানার দিকে।

ঝুমা বললো—যাবি বাবু আমার বাপুকে দেখতে?

যাবো, আজ নয়—আর একদিন।

ঝুমা একমুখ হাসি হেসে চলে গেলো।

বনহুরের চোখের সামনে ভেসে উঠলো জংলীরাণীর মুখখানা, আনমনা হয়ে গেলো সে মুহূর্তের জন্য।

হঠাৎ কে যেন কাঁধে হাত রাখলো বনহুরের।

ফিরে তাকাতেই আশ্চর্য হলো, তার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন মিঃ আর্ম। মুখে তাঁর হাসির আভাস, বললেন তিনি—মেয়েটি কে মিঃ আলম?

বনহুর হাতের বন্দুকটার দিকে তাকিয়ে বললো—ডাকবাংলোর বৃদ্ধ চৌকিদারের মেয়ে ঝুমা।

ঝুমা! চমৎকার নাম। আপনার সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে নিয়েছে দেখলাম।

ওঃ, আপনি তাহলে....

হাঁ, আমি বেশ কিছুক্ষণ হলো এদিকে এসেছি। দাঁড়িয়েছিলাম আমি টিলার আড়ালে, কারণ আমি এলে আপনাদের আলাপে যদি ব্যাঘাত ঘটে তাই!

বনহুর মিঃ আর্মের পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাকিয়ে দেখলো, তারপর পা বাড়ালো বাংলোর দিকে।

মিঃ আর্ম বললেন—শিকার করা আর হলো না বুঝি?

শিকার করার জন্য আসিনি, এসেছিলাম এদিকটা দেখতে, দেখা হয়ে গেছে।

চলুন ফেরা যাক। বনহুরের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে শুরু করলেন আর্ম।

চলতে চলতে বললেন মিঃ আর্ম—আমার বোন এ্যামের মুখে আপনার প্রশংসা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে! আপনার সঙ্গে এলাম তাই আলাপ করতে।

বনহুর হেসে বললো—প্রশংসা করার মত আমার কিছু নেই। আর কিই বা করেছি তাঁর যে প্রশংসা করবেন তিনি।

দেখুন আমার বোন বড় খেয়ালী, যাকে ওর ভাল লাগবে তাকে ও একেবারে মনের মনিকোঠায় বসিয়ে তার সাধনা করবে। আপনার সৌন্দর্য ওকে অভিভূত করেছে, সব সময় ও আপনার কথা বলে।

চলুন না মিঃ আলম, একদিন আমরা জলবিহারে যাই?

জলবিহার?

বুঝতে পারলেন না, জলবিহার কাকে বলে?

ঠিক পারছি না, কারণ নিকটে কোথাও সমুদ্র বা সাগর নেই কিনা?

ও, জলবিহার বলতে আপনি সমুদ্র ভ্রমণ কিংবা সাগরাভিযান মনে করেছেন বুঝি?

তবে?

জলবিহার বলে এখানে একটা জায়গা আছে—অতি চমৎকার জায়গা, চলুন না একদিন আমরা সেখানে যাই?

আচ্ছা, সময় হলে যাবো।

বনহুর কথাটা বলে এড়িয়ে গেলো এবং অন্য পথে পা বাড়ালো। যাবার সময় হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডসেক করলো মিঃ আর্মের।

❑

অন্ধকার কুঠরির মধ্যে রহমান মৃতের মত পড়ে আছে। তার চারপাশে পাথুরে দেয়াল, কোথাও একটু ফাঁক নেই যে বাইরের আলো কুঠরির ভিতরে প্রবেশ করবে। সমস্ত শরীরে তার চাবুকের আঘাতের চিহ্ন। প্রতিদিন তাকে কশাঘাত করা হয় এবং কিছু জানার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

রহমানের গোটা মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি জন্মেছে, চোখ বসে গেছে, চুল রুক্ষ এলোমেলো। তার হাত এবং পা মজবুত দড়ি দিয়ে বাঁধা।

দারুণ পিপাসায় কণ্ঠনালী শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আজ সপ্তাহ দুই হলো তাকে বন্দী করা হয়েছে, তারপর থেকে তাকে নির্মম যন্ত্রণা দেওয়া হচ্ছে। আরজু কোথায় কে জানে, আরজুকে ধরে আনার পর তার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয়নি। রহমান জানে না এরা কারা, তবে যে এরা ফাংহা হত্যা রহস্যের মূল স্তম্ভ এটা মিথ্যা নয়।

প্রতিদিন যখন রহমানকে এই অন্ধকারময় কুঠরি থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তার চোখ বাঁধা থাকলেও অনুমানে বুঝতে পারে তাকে কোনো গোপন সুড়ঙ্গপথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সে পথ ভূগর্ভে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যখন চোখের পট্টি খুলে দেওয়া হয় তখন রহমান দেখতে পায় একটা অদ্ভুত কক্ষে তাকে আনা হয়েছে। কক্ষটা বিরাট অথচ আধো অন্ধকার—একটা লালচে আলোর আভাস কক্ষটাকে আরও ভয়ঙ্কর করে

তুলেছে। সম্মুখে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে—তাদের চেহারা ভয়ঙ্কর, যেন এক একটা জানোয়ার।

রহমান তাকিয়ে দেখলো আরও একটা অদ্ভুত জিনিস, সে হলো একটা স্তম্ভ। স্তম্ভের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই একদৃষ্টে। রহমানও তাকালো সেই স্তম্ভটার দিকে। কয়েক মিনিট কেটে গেলো, স্তম্ভটার মধ্যে জ্বলে উঠলো একটা আলোকরশ্মি—অদ্ভুত সে আলোকরশ্মি, লালচে কক্ষটা আরও লালচে হয়ে উঠলো।

যমদূতের মত লোকগুলোকে এক একটা প্রেতাত্মার মত মনে হতে লাগলো।

রহমান আশ্চর্য হয়ে দেখলো আলোকস্তম্ভটার মধ্যে ধীরে ধীরে একটা ছায়ামূর্তি ভেসে উঠলো—কেমন যেন একটা অদ্ভূত মানুষ। চোখমুখ বা দেহ কিছুই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না, ছায়ামূর্তি নারী না পুরুষ তাও বোঝার উপায় নেই। এবার আওয়াজ হলো—এর হৃৎপিণ্ড যখন আমরা বের করে নেবো তখন এর কাজ শেষ হবে। তার পূর্বে এর কাছে জেনে নিতে হবে কি কারণে তারা ফাংহায় পদার্পণ করেছে। যদি সহজে আসল কথা ব্যক্ত করতে না চায় তবে যেভাবে ব্যক্ত করে তাই করতে হবে। যাও ওকে অন্ধকার কক্ষে আটক করে রাখোগে।

সেই থেকে রহমান অন্ধকার কারাকক্ষে বন্দী আছে। প্রতিদিন তার উপর চলে জঘন্য অত্যাচার। চাবুকের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে সমত দেহ। তারা জানতে চায় কে ঐ ব্যক্তি যে ফাংহার নির্জন ডাকবাংলোয় আশ্রয় নিয়েছে এবং কেনো সে ফাংহায়— এসেছে।

রহমান বুঝতে পারে, শুধু তাকেই নয়, আরজুকেও ওরা তারই মত বন্দী করেছে এবং তার কাছেও আসল কথা জেনে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। রহমান তবু কতকটা নিশ্চিন্ত, কারণ আরজু তাদের ফাংহা আগমনের আসল উদ্দেশ্য জানে না। তাকে হত্যা করলেও সে সঠিক কথা বলতে পারবে না এমন কি সর্দারের পরিচয়ও আরজু জানে না। রহমান তাই এ যন্ত্রণার মধ্যেও নিশ্চিন্ত আছে।

প্রতিদিন যখন রহমানকে ঐ বিরাট কক্ষে নিয়ে যাওয়া হতো তখনই সে দেখতো একটা মৃতদেহ কক্ষের মেঝের টেবিলে ঢাকা দেওয়া রয়েছে। আরও দেখতো কিছু তাজা রক্তের ছাপ টেবিলের পাশে।

অন্যান্য দিনের মত আজও রহমান অন্ধকার কক্ষে বসে বসে ভাবছে, ঐ মুহূর্তে দরজা খুলে গেলো, ভিতরে প্রবেশ করলো দু'জন বলিষ্ঠ লোক একজনের হাতে মশাল। মশালের আলোতে অন্ধকার কক্ষ আলোকিত হয়ে উঠলো।

রহমান সজাগ হয়ে তাকালো লোক দু'টির দিকে।

ওরা ততক্ষণে একেবারে এগিয়ে এসেছে নিকটে কর্কশ কণ্ঠে বললো একজন—ওঠো, যেতে হবে।

রহমান জানে, এখানে তার কোনো আপত্তি টিকবে না তাই সে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো। যদিও তার কষ্ট হচ্ছিলো উঠে দাঁড়াতে, কারণ তাদের দেহে ছিলো নানারকম আঘাতের চিহ্ন। হাঁটুর একপাশে কেটে গিয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিলো, ব্যথায় পা খানা বেশ ফুলে গিয়েছিলো তার।

লোক দু'জন রহমানকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো, তারপর নিয়ে চললো টেনে হিচড়ে। মৃত্যুকে ভয় করে না রহমান, তবু কষ্ট যা হচ্ছিলো তা তো সে অস্বীকার করতে পারে না। খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে চললো রহমান ওদের দু'জনকে অনুসরণ করে।

আবার সেই কক্ষ।

সেই আলোকস্তম্ভ, লালচে আলোতে গোটা কক্ষ লাল রক্তাভ। রহমানকে ওরা দাঁড় করালো সেই কক্ষের মেঝেতে, তারপর কোনো নির্দেশের অপেক্ষা করতে লাগলো তারা।

ধীরে ধীরে আলোকস্তম্ভের রং পরিবর্তন হলো, একটা ছায়ামূর্তি ভেসে উঠলো সেই আলোকস্তম্ভের মধ্যে, সেই অদ্ভুত আওয়াজ—নারী নারী কিংবা পুরুষের কণ্ঠ বোঝা গেলো না, নির্দেশ হলো এই যুবকের হৃৎপিণ্ড দরকার, এর বুক চিরে হৃৎপিণ্ড বের করে নেবে এবং আমাদের হৃৎপিণ্ড সংরক্ষিত পাত্রে জমা করে রাখবে। আমার মনে হয় এর হৃৎপিণ্ড কোনো মৃত ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডের পরিবর্তে সংযোজন করলে আমাদের সাধনা জয়যুক্ত হবে। এত নির্যাতনের পরও যে হৃৎপিণ্ড নষ্ট হয়ে যায়নি, নিশ্চয়ই তার বলিষ্টতা এবং কর্মশক্তি তীব্র রয়েছে। যাও, নিয়ে যাও, এর প্রতি নির্যাতন কমিয়ে দাও এবং একে সবল করে তোলার চেষ্টা করো—কিন্তু মনে রেখো, অন্ধকার কারাকক্ষ থেকে যেন ও বের হতে না পারে।

লোক দু'জন আলোকস্তম্ভের দিকে তাকিয়েছিলো, কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রহমানকে নিয়ে বেরিয়ে এলো কক্ষ থেকে, কিন্তু তার পূর্বেই চোখ বেঁধে দিলো ওরা রহমানের।

আবার সেই সুড়ঙ্গপথ।

রহমান এবার বুঝতে পেরেছে সে একেবারে ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছেছে। তাকে যারা পাকড়াও করে এনেছে তারাই হলো ফাংহা হত্যা রহস্যের মূল ব্যক্তি। এতদিন যতটুকু বুঝতে পেরেছিলো, আজ আরও পরিষ্কার হয়ে গেলো সবকিছু।

ওরা রহমানকে নিয়ে এলো পুনরায় সেই কক্ষে। হাতের বাঁধন খুলে দিলো তারপর ওরা বেরিয়ে গেলো। আজ নতুন করে কোনো নির্যাতন হলো না রহমানের উপর।

রহমান যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, যাক দু'চার দিন তবু নির্মম কশাঘাত থেকে রক্ষা পাবে। একটু পরেই দরজা খুলে গেলো, পূর্বের সেই ব্যক্তিদ্বয় ট্রের উপরে স্তূপাকার খাদ্যসম্ভার নিয়ে প্রবেশ করলো!

এখানে আসার পর এককানা রুটি আর এক গেলাস পানি ছাড়া কিছু সে খেতে পায়নি। আজ এত খাবার দেখে ক্ষুধা যেন বেড়ে গেলো দ্বিগুণ।

লোক দু'জন খাবারের ট্রে রহমানের সম্মুখে রেখে দিলো। যেমনি রহমান খাবারের দিকে হাত বাড়িয়েছে, অমনি যারা খাবার বহন করে এনেছিলো তারাই খেতে শুরু করলো।

রহমানকে একটুও ওরা খেতে দিলো না।

অবাক হলো না রহমান, কারণ সে জানে চাকর বা অনুচরের এমনি হয়। তারা বন্দীর জন্য খাবার এনে নিজেরাই খায়। মনে পড়লো আজ কান্দাইয়ের কথা। কান্দাই দুঃস্থ নগরবাসীর জন্য যখন সরকার কোনো খাদ্য সরবরাহ করতো কিংবা বিদেশ থেকে কোনো রিলিফ বস্তু আসতো তখন সরকারের অনুচরদের হতো জয় জয়কার। তারা দুঃস্থ-জনগণের মুখের গ্রাস নিয়ে নিজেরাই গোগ্রাসে খেতো, করতো—গুদামজাত, করতো নিজেদের। দুঃস্থ জনগণের আহার নিয়ে জ্ঞানী বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণই ছিনিমিনি খেলে, আর এরা তো গণ্ডমূর্খ নির্বোধ দুষ্টলোক।

রহমান কোনো চেষ্টাই চালালো না খাবারের দ্বারা উদর পূরণের জন্য।

প্রতিদিন এই অন্যায় অনাচার চললো।

রহমান শুধু নীরবে দেখতো ভাবতো সমস্ত দুনিয়াটার কথা। শুধু বন্দী সেই নয়, আরও অনেক বন্দী আছে যারা দুর্বল অসহায়—যারা কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না তাদের খাবারগুলো রোজ ওরা খায়, সবল দেহগুলোকে আরও সবল করে তোলে।

রহমান ভাবে, এখন সে কোথায় নিজেই জানে না। হয়তো সর্দার তাকে সন্ধান করে ফিরছে, হয়তো বা শত্রু তারও ক্ষতি সাধন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এটুকু বিশ্বাস রহমানের আছে যে তার সর্দারের কোনো ক্ষতি সাধন কেউ করতে পারবে না।

.এখানে রহমান যখন সর্দারের কথা ভাবচে তখন সর্দার সন্ধান করে ফিরছে রহমানের। সরাইখানার ভিতরে তন্ন তন্ন করে সন্ধান করেছে সে কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন কিছু আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি। বনহুর গভীর রাতে বিচরণ করে বেড়ায়—যখন সমস্ত পৃথিবী নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে তখন ডাকবাংলোর অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে আসে সে।

অন্যান্য দিনের মত বনহুর বেরিয়ে এলো বাইরে। দরজা বন্ধ করে ফিরে দাঁড়াতেই চমকে উঠলো সে, অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে কেউ যেন দেখতে পেলো।

বনহুর বললো— কে?

পরিচিত কণ্ঠস্বর—আমি মিঃ ইবন।

বনহুর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—আপনি!

হাঁ আমি।

এত রাতে আপনি....

আমি এসেছিলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করতে। এগিয়ে এলেন মিঃ ইবন।

বনহুর অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো মিঃ ইবনের মুখে। যদিও তাঁকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো না তবু বেশ বুঝতে পারলো মিঃ ইবনের শরীরে নাইটড্রেস রয়েছে।

ততক্ষণে ইবন আরও সরে এসেছে বনহুরের পাশে..... বললেন আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে। যদি দয়া করে ভিতরে চলেন তবে বসে বসে আলাপ করবো।

বনহুর একটু হকচকিয়ে গেলো, কারণ এতরাতে সে অতি সন্তর্পণে বাইরে যাচ্ছিলো। মিঃ ইবন যে তার পথ রোধ করে এসে দাঁড়াবেন এটা সে

ভাবতে পারেনি। বললো বনহুর—ঘরে বেশ গরম তাই বাইরে এলাম ঠাণ্ডা হাওয়া সেবন উদ্দেশ্যে। চলুন ঐ টিলাটার উপরে গিয়ে বসি।

না তা হয় না, আপনার ঘরে বসেই আলাপ করবো, কারণ আমার স্ত্রী এবং আমার শ্যালক এরা আমাদের আলাপ আলোচনা শুনে ফেলতে পারে। চলুন না ভিতরে গিয়ে বসি।

ভিতরে যা অন্ধকার।

কেন লাইট নেই?

আজ ঘরের আলোটা নষ্ট হয়ে গেছে

তাহলে তো বড় অসুবিধা! একটু ভাবলেন মিঃ ইবন—তারপর বললেন—অন্ধকার হোক তবু ভাল, কারণ বাইরেও অন্ধকার ভিতরেও অন্ধকার। তবে ভিতরের অন্ধকার পবিত্র, কারণ সেখানে কোনো ভয় নেই।

বনহুর মিঃ ইবনের কথায় বিরক্ত হচ্ছিলো তবু সে বাধ্য হলো দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করতে। মিঃ ইবন তার পিছনে তাকে অনুসরণ করলেন।

বনহুর পকেট থেকে ম্যাচ বের করে একটা মোমবাতি ধরালো।

মোমবাতির ক্ষীণালোকে বনহুর তাকালো মিঃ ইবনের মুখের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো সে। মিঃ ইবনের মুখমণ্ডল কেমন যেন ফ্যাকাশে বলে মনে হলো তার কাছে। বনহুর একটা আসন এগিয়ে দিয়ে বললো—বসুন।

মিঃ ইবন বসলেন, তারপর চাপা গলায় বললেন—আপনি রাতে ঘুমান না বুঝি?

হঠাৎ এ ধরনের প্রশ্ন বনহুরকে বিব্রত করলো, তবু সে নিজকে সামলে নিয়ে বললো—ঘুম তেমন হয় না, কারণ আমার ব্যবসা বড় মন্দা চলছে কিনা—তাই বড় দুঃশ্চিন্তায় আছি।

উৎসাহভরে মিঃ ইবন বলে উঠেন—ঠিক আমারও তাই। আজ ক'দিন ধরে কি যে চলছে-কোন কাজকর্ম হচ্ছে না—সবদিকে বিফল...একটু ভাবগম্ভীর হয়ে পড়লেন মিঃ ইবন।

বনহুর বললো—দেখছি আমার অবস্থাই আপনাকে ফলো করে চলেছে.. বলে হাসলো বনহুর।

মিঃ ইবন কিন্তু হাসলেন না, তিনি ব্যথাভরাকণ্ঠে বললেন—বড় আফসোস, এমন অবস্থা হবে পূর্বে ভাবতে পারিনি—এসেছিলাম অনেক আশা নিয়ে।

বনহুর মোমের আলোতে ভালভাবে তাকালো মিঃ ইবনের মুখের দিকে। সত্যিই একটা ব্যথাকাতার ভাব ফুটে উঠেছে তাঁর মুখমণ্ডলে।

বনহুর পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো তারপর একরাশ ধোঁয়া নির্গত করে বললো— আপনার স্ত্রী মিসেস এ্যাম এখন কি ঘুমাচ্ছেন?

হাঁ কিন্তু আসল ঘুম কিনা তা জানি না।

তার মানে?

মানে আমি যতক্ষণ তার বিছানায় থাকি ততক্ষণ সে ঘুমের ভান করে চুপচাপ পড়ে থাকে। আমি বিছানা ত্যাগ করলে সে আরামে ঘুমায় কিংবা বিছানা ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে তার ভাই মিঃ আর্মের পাশে। দু' ভাই-বোন মিলে চলে গোপন শলা-পরামর্শ। জানেন মিঃ আলম, আমি ওসব ভালবাসিনা কিনা, তাই ও আমাকে পছন্দ করে না—মানে আমি মিসেস এ্যামের উপযুক্ত স্বামী হতে পারিনি—একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে মিঃ ইবন।

গভীর রাতে এই ভদ্রলোকটাকে মোটেই বরদাস্ত করতে পারছে না বনহুর। সে আপন মনে সিগারেট টেনে চলেছে। মিঃ ইবন আরও কিছুক্ষণ আপন মনে বক বক করে এক সময় উঠে দাঁড়ালেন, বনহুরের দিক থেকে তেমন কোনো আগ্রহভরা প্রশ্ন বা উত্তর না পেয়ে নীরব হলেন তিনি।

বনহুর বললো—রাত এখন চারটে, কাজেই আমার নিদ্রার সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

এতক্ষণে যেন হুশ হলো মিঃ ইবনের, তিনি উঠে দাঁড়ালেন—তাহলে চলি মিঃ আলম?

আচ্ছা আসুন।

মিঃ ইবন বেরিয়ে যান।

বনহুর সেদিনের মত ঘরের বাইরে যাওয়া থেকে ক্ষান্ত হলো এবং শয্যা গ্রহণ করলো।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে বনহুর বুঝতেই পারেনি। ঘুমিয়ে পড়তেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো মনিরার মুখ খানা। বহুদিন পর সে যেন মনিরার পাশে গিয়ে হাজির হয়েছে, হাসিভরা মুখে মনিরা তাকে জানাচ্ছে সাদর সম্ভাষণ। বলছে মনিরা, তুমি বড় দুষ্ট, এতদিন কোথায় ছিলে বলো তো? বনহুর জবাব দিলো দুষ্ট আমি মোটেই নই মনিরা। আমি সব সময় তো তোমার পাশেই আছি। তুমি আমাকে দেখতে পাও না। মনিরা অভিমানভরা গলায় বললো—মিথ্যে কথা, তুমি চলে গেছো দূরে অনেক দূরে। নিজের কাজ নিয়ে মেতে আছো, একটি বার আমার কথা মনে করো

না। নূর বিদেশ যাওযার পর আমি যে বড় একা, তুমি কি তা জানো না। বৃদ্ধা মামীমা তিনিও সব সময় বিষণ্ণ মনে দিন কাটান। তুমি বড় নিষ্ঠুর নাহলে এমন করে ভুলে থাকো। বনহুর ওর অভিমানভরা মুখখানা তুলে ধরে বলে——লক্ষ্মীটি রাগ করোনা, যতদূরেই থাকি না কেন, তোমাদের কথা সবসময় আমার মনে হয়, জানো, নূর বিদেশ থেকে যখন ফিরে আসবে সে তখন অনেক বড় স্বনামধন্য একজন.....

বলো মনিরা, বলো থামলে কেন?

সে হবে মস্তবড় বিশ্ববিখ্যাত ডিটেকটিভ....

এ তুমি কি বলছো?

হাঁ, আমি জানি সে সাধারণ মানুষ হবে না।

ওগো, আমি চাই না নূর বিশ্ববিখ্যাত ডিটেকটিভ হোক। আমি চাই না, আমি চাই না....

চুপ করো মনিরা, চুপ করো। তুমি যতই বলো নূর ডিটেকটিভ হবেই। ছোটবেলা থেকেই ওর মধ্যে আমি দেখেছি সে এক অদ্ভুত প্রতিভা....

না না, আমি তা চাই না।

মনিরা, তুমি না চাইলেও সে হবে এবং তোমার স্বামীকে সে....

চুপ করো, আর বলো না, আমি সে কথা ভাবতে পারি না।

মনিরা, মিছেমিছি তুমি দুঃখ পাচ্ছো, তুমি কি জানো না দুনিয়ার যে নিয়ম তার ব্যতিক্রম হবে না কোনোদিনই। শিশুকাল থেকে নূরের সাধনা সে ডিটেকটিভ হবে, তারপর সে খুঁজে বের করবে দস্যু বনহুরকে।

না না, আমি সে কথা বিশ্বাস করি না, দস্যু বনহুরকে কোনো ডিটেকটিভ বা কোনো পুলিশবাহিনী কোনোদিন গ্রেপ্তার করতে পারেনি, পারবেও না। মনিরা স্বামীর বুকে মুখে গুঁজলো।

বনহুর মনিরাকে গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলো। ঠিক ঐ মুহূর্তে ঘুম ভেঙ্গে যায় বনহুরের।

জেগে উঠতেই মনটা কেমন যেন খাঁ খাঁ করে উঠলো——কই, পাশে মনিরা কই, এইতো একটু পূর্বেই তার বুকে মুখ গুঁজে শুয়েছিলো সে। বনহুর চোখ মেলতে দেখলো বেলা হয়ে গেছে। মুক্ত জানালা দিয়ে এক ঝলক সোনালি রোদ এসে ছড়িয়ে পড়েছে মেঝেতে।

বনহুর পাশ ফিরে শুয়ে স্বপ্নদৃশ্যটা স্মরণ করে চললো। ঠিক ঐ সময় দরজায় মৃদু আঘাত পড়লো।

রাতে মিঃ ইবন বেরিয়ে যেতেই বনহুর দরজায় খিল বন্ধ করে দিয়ে তারপর শয্যা গ্রহণ করেছিলো। এই মুহূর্তে দরজায় মৃদু করাঘাতের আঘাতে বনহুর বিরক্তি বোধ করলো তবু বাধ্য হলো সে দরজা খুলতে।

দরজা খুলতেই অবাক হলো বনহুর—এ যে বাংলোর চৌকিদার বিহাগীর মেয়ে ঝুমা। হাতে তার একটা ঝাকা, ঝাকাভর্তি ফল। দরজা খুলে বনহুর কোনো কথা বললো না, সে নীরবে তাকালো ঝুমার দিকে।

ঝুমা বললো—বাবুজী, তোর জন্য ফল এনেছি। খাবি বাবু?

বনহুরের মনে তখনও মনিরার ছবি ভাসছে; মনিরার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি সে শুনতে পাচ্ছে কানে। ঝুমার কণ্ঠ যেন ওর কাছে মনিরার কণ্ঠ বলে মনে হলো, বললো—এসো ভিতরে এসো।

ঝুমা উচ্ছল ঝরণার মত প্রবেশ করলো সেই কক্ষে, ফলের ঝুড়িটা টেবিলে রেখে বললো—এসব তোর জন্য এনেছি বাবু, খাস্—আমি যাই....

বললো বনহুর—না, বসো ঝুমা।

বাবু!

হাঁ বসো।

ঝুমা বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে ফিক করে একটু হেসে বসে পড়লো একটা চেয়ারে।

চেয়ারে সে কোনোদিন বসেছে কিনা সন্দেহ। চেয়ারে বসে ছোট্ট শিশুর মত পা দোলাতে লাগলো সে।

বনহুর বললো—ঝুমা, এত সুন্দর ফল তুমি কোথায় পেলে?

বললো ঝুমা—আমার দাদা আছে, বড় ভাই—সে-ই এ ফল আমাকে খাওয়ার জন্য এনে দিয়েছিলো।

তা তুমি আমার জন্য আনলে কেন?

বাবু, কাল তোকে টিলার উপর দেখেছিলাম না? সত্যি বাবু, তোকে আমার খুব ভাল লেগেছে। আর ভাল লেগেছে বলেই তোর জন্য এ ফলগুলো নিয়ে এলাম।

বনহুর ঝুড়ি থেকে একটা ফল তুলে নিলো হাতে, তারপর নেড়েচেড়ে দেখে ফলটা ঝুড়িতে রাখলো।

ঝুমা বললো—খেয়ে নে বাবু।

আচ্ছা খাবো।

না বাবু, এক্ষুণি খেয়ে নে! ঝুমা কথাটা বলে একটা ফল নিয়ে বনহুরের মুখের কাছে ধরলো— নে বাবু, খেয়ে নে ফলটা।

ঝুমা বনহুরের মুখের কাছে ফলটা চেপে ধরলো—ঠিক ঐ মুহূর্তে দরজার ওপাশে এসে দাঁড়ালেন মিসেস ইবন ঝুমাকে মিঃ আলমের কক্ষে দেখে এবং ঝুমা আলমকে ফল তুলে খাওয়াচ্ছে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। কিন্তু সে বেশিক্ষণ দাঁড়ালো না, সরে গেলো নিঃশব্দে।

নিজের ঘরে প্রবেশ না করে এগিয়ে গেলো পাশের ছোট্ট কামরাটার দিকে। ঐ কামরায় তার ভাই ঘুমায়।

মিসেস ইবন ভাইয়ের বিছানার পাশে গিয়ে ওর গায়ে হাত রেখে ডাকলো—আর্ম, আর্ম উঠো, উঠো দেখবে চলো....

চোখ রগড়ে উঠে বসলো আর্ম—এ্যাঁ, এ্যামি কি বলছো।

বলছি সেই মেয়েটা এসেছে যার কথা তুমি কাল রাতে আমার কাছে বলেছিলে?

ও, সেই সাঁওতাল মেয়েটার কথা বলছো এ্যাম?

হাঁ, সে মিঃ আলমের কক্ষে এসেছে।

বলো কি এ্যাম।

হাঁ, দেখবে এসো।

মিঃ আর্ম উঠে দাঁড়ালেন এবং বোনকে অনুসরণ করে বেরিয়ে এলেন বাইরে। তাঁর চোখেমুখে একটা অস্বাভাবিক ভাব পরিলক্ষিত হলো।

ভাইবোন মিলে এসে দাঁড়ালেন দরজার আড়ালে আত্মগোপন করে। এ্যাম বললো—ঐ দেখো আর্ম, মেয়েটা নিজ হাতে মিঃ আলমের মুখে ফল তুলে দিচ্ছে।

আর্ম একটুখানি শব্দ করলো—হুঁ!

ঝুমার কণ্ঠ শোনা গেলো—বাবুজী, তোকে আমার খুব ভাল লাগে।

মিঃ আলম কি বললো শোনা গেলো না।

মিঃ আর্ম এবং মিসেস ইবন দরজার আড়াল থেকে সরে গেলো। একটা হিংস্রভাবে ফুটে উঠলো মিঃ আর্মের মুখে, সে মিসেস ইবনের কানে মুখ নিয়ে কি যেন ফিস ফিস করে বললো।

বনহুর তখন ফল খাচ্ছে, তার পাশে বসে ঝুমা ওর মুখে ফল তুলে দিচ্ছে।

বনহুরের চোখের সামনে তখন ভাসছে মনিরার মুখখানা। ঝুমার কথাগুলো বনহুরের হৃদয় স্পর্শ করে। এই নির্জন নিঃসঙ্গ অবস্থায় ঝুমাকে ওর ভাল লাগে, মনে হয় ঝুমা এসে ভালই করেছে।

বনহুর কতদিন পর আজ পেট পুরে অনেকগুলো ফল খেলো। তৃপ্তি ভরে খেলো সে, কান্দাই থেকে আসার পর এত ফল সে এক সঙ্গে খায়নি।

বললো ঝুমা—বাবু, তুই ফল খুব ভালবাসিস, না?

হুঁ ঝুমা।

বাবু, রোজ আমি তোমার জন্য ফল নিয়ে আসবো। ঝুমার দু'চোখে খুশির উৎস।

ঝুমা বেরিয়ে গেলো ডাকবাংলো থেকে।

বনহুর তাকিয়ে রইলো ওর চলে যাওয়া পথের দিকে।

ঝুমা এগুতেই পথরোধ করে দাঁড়ালেন আর্ম—এই তোর বাবার অসুখ কেমন হলো?

ঝুমা থেমে পড়লো, চোখ তুলে তাকালো মিঃ আর্মের মুখের দিকে।

মিঃ আর্ম বললেন—তোমার বাবার অসুখ কেমন হলো?

ঝুমা বললো— ভাল হয়নি, বাবা আরও দুর্বল হয়েছে।

তোর বাবা কাজে আসতে পারে না, তুই তো কাজ করতে পারিস? বাংলো ঝাড়ু দেওয়া, পরিষ্কার করা এ সব তো তোকেই করতে হবে। আজ থেকে তুই করবি, বুঝলি?

ঝুমা বললো— আচ্ছা বাবু, আমিই করবো। চলে যায় ঝুমা।

মিঃ আর্ম ফিরে আসেন নিজের ছোট্ট কামরাটার মধ্যে। একটা মৃদু হাসির আভাস ফুটে উঠে তার ঠোঁটের কোণে।

ঝুমা ওর বাপের কাছে বিদায় নিয়ে এলো ডাকবাংলোয়, আসার সময় বাপুকে বলে এলো— তুই কাজে যেতে পারিস্না, বাবুরা রাগ করে— কাল থেকে আমিই কাজে যাবো।

ঝুমার চোখেমুখে আনন্দোচ্ছ্বাস, কাল থেকে সে ডাকবাংলায় কাজে যাবে। ঝুমার মনটা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠে। তার বড় সাধ বাবুকে দেখা, তারসঙ্গে একটু কথা বলা।

ঝুমার বাবা বললো— হাঁ মা, কথাটা আমিই তোকে ক'দিন থেকে বলবো বলবো করছি কিন্তু বলতে সাহস পাইনি, কেনো জানিস্ মা?

কেন তুই সাহস পাসনা বাপু?

এখন বড় হয়েছিস, জোয়ান হয়েছিস, মা, কে কি বলবে তাই ....

ওসব তুই কিচ্ছু ভাবিস্ না বাপু, আমি তোর বদলে কাজ করবো।

পরদিন থেকে ঝুমা যায় ডাকবাংলোয়, ঘরগুলো সব পরিষ্কার করে ঝাড়ু দেয়, তারপর আঁচল দিয়ে মোছে আসবাবগুলো।

ঝুমা তেমন করে আয়নায় মুখ দেখেনি। তার বাপু মেলা থেকে ছোট্ট একটা আয়না এনে দিয়েছিলো, সে আয়নায় ঝুমার গোটা মুখ পরিষ্কারভাবে দেখা যেতো না। আজ ঝুমা বাবুজীর ঘরে প্রবেশ করে বড় আয়নাখানার পাশে দাঁড়ালো। গোটা ঘর সে বেশ করে ঝাড় দিয়েছে, এবার সে আঁচল দিয়ে আয়নাখানা মুছতে গেলো। ঝুমা আঁচল খুলে যেমনি আয়নায় আঁচলখানা বুলোতে গেলো অমনি তার নিজের প্রতিছচ্ছবির উপরে নজর পড়লো। নিজের সমস্ত দেহের প্রতিবিম্ব সে এমন করে দেখেনি কোনোদিন, ঝুমার দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময়, সে এত সুন্দর তা ভাবতে পারেনি কোনোদিন।

অবাক হয়ে ঝুমা দেখছিলো নিজের রূপ।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করে বনহুর, আলগোছে সে সরে দাঁড়ায় আড়ালে। আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে ঝুমার কার্যকলাপ। যেমন .... কোন পায়রা আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নানারকম শব্দ করে নিজের মনোভাব প্রকাশ করে তেমনি ঝুমা ঘুরে ফিরে আয়নায় নিজকে লক্ষ্য করছিলো আর মুখে একরকম অদ্ভুত শব্দ করছিলো।

আড়ালে আত্মগোপন করে বনহুর মৃদু মৃদু হাসছিলো। ঝুমার চঞ্চলতাপূর্ণ কার্যকলাপ তার কাছে বেশ লাগছিলো।

হঠাৎ বেরিয়ে পড়লো বনহুর।

ঝুমা তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে আয়নাখানা পরিষ্কার করতে লেগে গেলো।

হেসে বললো বনহুর— কি করছো ঝুমা?

ঝুমা আয়নাখানা মোছা শেষ করে ততক্ষণে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বললো —বাবু, আজ থেকে আমিই ডাকবাংলোয় সব কাজ করবো— বাপুর অসুখ কিনা, তাই সে আসতে পারে না।

বললো বনহুর— বেশ তো তাই করো।

বাবু, আমি খুব ভাল করে কাজ করবো, বখশিস দিবি না?

দেবো।

কি দিবি বাবু?

তুই যা চাইবি।
সত্যি তাই দিবি বাবু?
হাঁ বল কি চাস?
আজ না বাবু, যেদিন চাইবো, তুই দিবি তো?
দেবো। বললো বনহুর।
ঝুমা তখন বেরিয়ে গেলো পাশের কামরায়।
এরপর থেকে রোজই আসতো ঝুমা ডাকবাংলার কাজে । সুন্দর করে পরিষ্কার করতো সে গোটা বাংলা। কাজ শেষ করেই ঝুমা চলে আসতো বনহুরের কক্ষে। আঁচলে আয়নাখানা মুছতে মুছতে দেখতো নিজের চেহারাখানা। পুলকিত হয়ে উঠতো ঝুমা নিজের সৌন্দর্য দেখে।
একদিন বনহুর শুয়েছিলো বিছানায়।
ঝুমা ঘর পরিষ্কার শেষ করে উঠে এলো আয়নার পাশে, নিজের মুখখানা সে দেখতে লাগলো বারবার ফিক করে একটু হেসে বললো ঝুমা— বাবু, আজ বাইরে যাবি না?
বনহুর বললো— হাঁ, যাবো।
বাবু, রোজ কোথায় যাস্ তুই?
কাজে।
হাঁ।
কি কাজ করিস্ বাবু?
তুমি বুঝবে না।
বল্ বাবু, ঠিক বুঝবো?
রোজ যে মানুষগুলো খুন হচ্ছে, আমি সেই ...
তুই খুনী? বাবু .... বাবু, তুই সেই খুনী?
ঝুমা, তোমার কি মনে হয় আমি সেই খুনী?
তা আমি কেমন করে বলবো বাবু! তুই না কে তা জানে— ঐ ঈশ্বর ... বাবু, জানিস্ আজ রাতে আমার এক চাচার ছেলে খুন হয়েছে?
তোমার চাচার ছেলে?
হাঁ, বড় ভাল ছিলো সে। আজ রাতে সে আর কাজ থেকে ফিরে আসেনি ... গলাটা ধরে আসে ঝুমার।
বনহুর আনমনা হয়ে যায়, একটু ভেবে নিয়ে বলে— ঝুমা, তোমার চাচাতো ভাইয়ের লাশ পেয়েছো?

বাবু, আমরা পাইনি, শুনলাম পুলিশ লাশ উদ্ধার করেছে।

বনহুর একটা অস্ফুট শব্দ করলো —হু।

ঝুমা তাকালো বনহুরের মুখের দিকে, কারণ তার কানে বনহুরের কণ্ঠ কেমন যেন অদ্ভুত লাগলো। বললো ঝুমা— বাবু, আমার চাচাতো ভাই রুহিয়ার জন্য তোর খুব কষ্ট লাগছে, না?

বনহুরের অন্যমনস্ক ভাব কেটে গেলো, বললো— হাঁ, খুব কষ্ট লাগছে। রুহিয়ার লাশ তুই দেখেছিস্ ঝুমা?

না, আমার বড় ভয় লাগে, আমি মরামানুষ দেখতে পারি না বাবু। তুই যখন মরবি তখন .... কথাটা বলতে বলতে ঘরে প্রবেশ করে সরাইখানার মালিক, চোখ দুটো দিয়ে যেন তার আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

এক সঙ্গে ফিরে তাকালো বনহুর আর ঝুমা।

বনহুরের দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো।

ঝুমার মুখখানাও ফ্যাকাশে হলো মুহূর্তের জন্য, একটা ঢোক গিলে বললো ঝুমা— বাবুজী, আমি এখন যাই।

বনহুর কোনো জবাব দেবার পূর্বেই বেরিয়ে গেলো ঝুমা।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললো— আপনি এভাবে আমার কামরায় প্রবেশ করলেন কেন? বলুন, কেন আপনি প্রবেশ করলেন?

একমুখ হাসি হেসে বললো সবাইখানার মালিক— আমি পুরোন মানুষ, তাই কোনো অনুমতি নেবার প্রয়োজন আমার হয় না। চমৎকার লোক তো আপনি!

এ ডাকবাংলার জন্ম হবার পর থেকেই আমি এখানে বিনাদ্বিধায় আসা-যাওয়া করে থাকি, কেউ কোনোদিন আমার উপর বিরক্ত হয় না, আর আপনি ....

মালিকের কথাগুলো বনহুরের মনে আরও ক্রুদ্ধভাব সৃষ্টি করলো। মালিককে লক্ষ্য করে বললো বনহুর— তবু আপনি বিনা অনুমতিতে আমার কামরায় প্রবেশ করে ভাল করেননি, কারণ আমি এমন লোককে পছন্দ করি না।

বেশ, তাহলে আর আসবো না, তবে আজ কেন এসেছিলাম বলি?

বলুন?

একদিন রাতে আপনি আমার সরাইখানায় গিয়েছিলেন, তখন আপনার রুমালখানা আপনি ভুল করে ফেলে এসেছিলেন। একটু থেমে পকেট

হাতড়ে বের করলো সে একটা রুমাল। রুমালখানা মালিক এগিয়ে ধরলো বনহুরের দিকে— এই নিন।

বনহুর অবাক হলো, কোন মুহূর্তে তার পকেট থেকে রুমালখানা পড়ে গিয়েছিলো সে বুঝতেই পারেনি। একটু হকচকিয়ে গিয়ে হাত বাড়ালো বনহুর।

রুমালখানা হাতে নিয়ে বনহুর নেড়েচেড়ে দেখলো, একটু লজ্জিতও হলো সে কারণ এ রুমালখানা যখন তার পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিলো তখন তার ড্রেস স্বাভাবিক ছিলো না— সে তখন ছদ্মবেশে ছিলো, এক সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত ছিলো তার দেহ। ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে উঠলো বনহুরের, তবে কি মালিক তার ছদ্মবেশ অবস্থা জেনে গিয়েছিলো? নিশ্চয়ই তাই হবে, নাহলে কেমন করে সে জানতে পারলো এ রুমালখানা তার।

বনহুরের চিন্তাযুক্ত মনোভাব লক্ষ্য করছিলো মালিক, সে বললো —আপনি রুমালখানা ফেরত পেয়েও একবার ধন্যবাদ জানালেন না।

ধন্যবাদ জানানোর মত আমার এ রুমালখানার কোনো মূল্য নেই।

ও, তাই নাকি? বললো মালিক।

বনহুর তাকালো মালিকের মুখের দিকে।

মালিক পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে এগিয়ে ধরলো বনহুরের দিকে—নিন।

বনহুর একটা সিগারেট তুলে নিলো হাতে।

মালিক এবার ম্যাচ বের করে বাড়িয়ে ধরলো।

বনহুর সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে একমুখ ধুয়া ছেড়ে বললো—বসুন।

মালিক যেন আঁতকে উঠলো—সর্বনাশ, এই সময় আমি বসতে পারি! আবার দেখা হবে। বলে দ্রুত বেরিয়ে গেলো মালিক।

একটু হাসির আভাস ফুটে উঠলো বনহুরের মুখে।

মালিক বেরিয়ে যাবার পর পরই বনহুর তাঁর ছোট্ট ব্যাগটা নিয়ে বাথরুমে প্রবেশ করলো।

বনহুর যখন বাথরুম থেকে বের হলো, তখন তাকে চিনবার জো নেই, সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে সে—ঠিক একটি সাঁওতাল যুবক বলেই তাকে মনে হচ্ছিলো।

বনহুর বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই পিছন থেকে কেউ যেন তার কাঁধে হাত রাখলো।

চমকে ফিরে তাকালো বনহুর।

সঙ্গে সঙ্গে কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিলো মিঃ আর্ম—কাকে খুঁজছিস্?

বনহুর নিজকে সামলে নিলো মুহূর্তে, স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো—বাবুজীকে!

বাবুজী! কোন্ বাবুজীকে খুঁজছিস্ তুই?

এই যে এ ঘরে থাকে তাকেই খুঁজছি, তিনি ভিতরে আছেন কি?

মিঃ আর্ম বললেন—কি জন্য তাকে খুঁজছিস্ কি দরকার আমাকে বল্—আমি বাবুজীকে বলবো।

ঝুমা আমার বোন, বাপুর অসুখ, তাই সে এখানে কাজ করে। ও কাজে এসেছিলো, এখনও ফিরে যায়নি, তাই এসেছি খোঁজ করতে।

মিঃ আর্মের ললাট কুঁচকে গেলো, চিন্তার ছাপ পড়লো তাঁর চোখেমুখে, বললেন—তাই নাকি, তোর বোন এখনও ফিরে যায়নি, বলিস কি!

হাঁ বাবু, তাই তো এলাম।

যায়নি তাহলে ঝুমা? দাঁড়া, আমি ভিতরে দেখে আসি, নিশ্চয়ই সে এই কক্ষের মধ্যে আছে। মিঃ আর্ম ডাকলেন—ভিতরে আছেন মিঃ আলম, আসতে পারি? কথা কয়টা বলে বিনাদ্বিধায় প্রবেশ করলেন তিনি।

কক্ষে প্রবেশ করে অবাক হলেন মিঃ আর্ম, কারণ কক্ষে তখন কেউ ছিলো না। মিঃ আর্ম কক্ষে ভালভাবে সন্ধান চালিয়ে ফিরে এলেন বাইরে।

সাওতাল যুবকের বেশে দস্যু বনহুর তখনও দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়, সে আর্মের মনোভাব জানার জন্যই অপেক্ষা করছিলো।

মিঃ আর্ম কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন মুখ কালো করে, তিনি ভেবেছিলেন নিশ্চয়ই কক্ষমধ্যে মিঃ আলম ও ঝুমাকে পাবেন। ওদের দু'জনকে একত্রে পেলে মিঃ আর্ম খানিকটা অপমান করতেন। মিঃ আর্ম এসে বললেন—তোর বোন কিছু পূর্বে মিঃ আলমের কক্ষে ছিলো, আমি নিজের চোখে দেখেছি। জানিস্ তোর বোনকে হাত করার চেষ্টায় আছে এই কক্ষে যিনি থাকেন তিনি......একটু থেমে বললো, ঝুমাকে বলে দিস্, সে যেন মিঃ আলমের কাছে না যায়, বা তার কোন কথা না শোনে। আমি যা বলবো, সব কথা মেনে নিতে বলিস্, বুঝলি?

বুঝেছি বাবুজী! এখন তাহলে যাই?

যা, কিন্তু যাবার পূর্বে শুনে যা, তোর বোন ঝুমা যেন ভুল করেও মিঃ আলমের সঙ্গে কথা না বলে।

আচ্ছা বাবুজী, আপনার কথা মনে থাকবে। কথাটা শেষ করেই নেমে যায় সাঁওতাল যুবকবেশী স্বয়ং দস্যু বনহুর।

মিঃ আর্ম ফিরে যান নিজের ঘরে। কোনো জায়গায় ফোন করার জন্য রিসিভার তুলে নেন হাতে।

ঠিক ঐ সময় একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ায় তার পাশে।

মিঃ আর্ম উঠে দাঁড়ান, মুখখানা তাঁর ফ্যাকাশে হয়ে উঠে, রিসিভার রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ান।

ছায়ামূর্তি গম্ভীরকণ্ঠে বলে উঠলো—সাবধান, কেউ যেন জানতে না পারে, তুমি কি করছো—পাশের কক্ষে যিনি থাকেন, তিনি সাধারণ ব্যক্তি নন।

কথাগুলো যদিও গম্ভীর ছিলো, তবু মিঃ আর্ম বুঝতে পারে এ কণ্ঠ পুরুষের নয়, নারীর।

বিস্মিত হলেন মিঃ আর্ম, রিসিভার রেখে দিলেন তিনি আলগোছে।

❑

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বনহুর।

একটু পূর্বে সে নিজ দেহ থেকে সাঁওতালী ড্রেস খুলে ফেলেছে। আজ তার মুখোভাব প্রসন্ন, অনেকটা স্বাভাবিক। বিছানায় দেহটা এলিয়ে দেয় সে নিশ্চিন্ত মনে।

ছোট্ট একটু কাশির শব্দ কানে আসতেই চোখ তুলে তাকায় বনহুর, সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসে সে।

কক্ষে প্রবেশ করে মিসেস ইবন—হঠাৎ হাসির শব্দ শুনে থাকতে পারলাম না। ব্যাপার কি মিঃ আলম?

বনহুর বললো ও, আপনি তাহলে এখনও শোনেননি? আপনার স্বামী জানেন, কারণ তিনি আমার সম্বন্ধে অবগত আছেন।

হাঁ, শুনেছি আপনি নাকি ভৌতিক সাধনা করেন?

সেই সাধনাবলেই আমি বেঁচে আছি মিসেস ইবন। বসুন!

মিসেস ইবন অদ্ভুত দেহভঙ্গিমায় বসে পড়ে বললেন—আমি ভূতের ভয় করি সত্য, তাই বলে মানুষ ভূতকে আমি ভয় করি না মিঃ আলম। আপনি তো মানুষ ভূতের সাধনা করেন?

বনহুর তীক্ষ্ণচোখে তাকালো মিসেস ইবনের দিকে, হেসে বললো—অদৃশ্য ভূতের চেয়ে মানুষ ভূত বেশি মারাত্মক, তাই আমি মানুষ ভূতের সাধনা করি।

মিসেস ইবন বললেন—তাহলে আমার সাধনা মিথ্যা নয় মিঃ আলম?

আপনি যা বলেছেন সত্য কথাই বলেছেন, মিসেস ইবন।

মিসেস ইবন বলে উঠলো—আমাকে আপনি মিসেস ইবন না বলে এ্যামি বলেই ডাকবেন, কারণ আমি ইবনের স্ত্রী বটে কিন্তু তা আমি স্বীকার করি না। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে আবার মিসেস ইবন—মিঃ আলম, আপনি বড় স্বার্থপর, নিজকে ছাড়া কিছু বোঝেন না। একা থাকি, মাঝে মাঝে আমার কামরায় আসবেন, তা নয়—কোনো সময় আপনার দেখাই মেলে না।

মিসেস ইবন আসন ত্যাগ করে বনহুরের শয্যার পাশে এসে বসে, এমনভাবে বসলো যেন তার দেহের ছোয়া মিঃ আলমের গায়ে স্পর্শ করে।

বনহুর বিব্রত বোধ করলো, একটু সরে বসলো সে। এমনি ঘটনা আরও একদিন ঘটেছিলো ফাংহার ডাকবাংলোয়।

বনহুর সরে বসলেও রেহাই পেলো না সে মিসেস ইবনের কাছ থেকে, সে নিজের দেহটা এলিয়ে দিলো বনহুরের কোলে।

ভীষণ অপ্রস্তুত হলো বনহুর, খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। সে নড়তেও পারে না, সরতেও পারে না। মিসেস ইবন যে এমনভাবে তার কোলের উপর দেহটা আচম্বিতে এলিয়ে দেবে, ভাবতেও পারে নি সে।

মিসেস ইবন দক্ষিণ হাতে বনহুরের গলা জড়িয়ে ধরলো, মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললো—মিঃ আলম, আপনি...আপনি আমাকে যত দূরেই সরিয়ে রাখেন না কেন, আমি কোনোদিন আপনাকে দূরে সরে যেতে দেবো না।

বনহুর শান্তকণ্ঠে বললো—মিসেস এ্যামি, আপনি অসংযত হয়ে পড়েছেন।

না, আমি ঠিক আছি।

আপনার মুখ দিয়ে সুরার গন্ধ আসছে। মিসেস এ্যামি, আপনি ফিরে যান আপনার কক্ষে। আপনার স্বামী যদি আপনাকে এ অবস্থায় দেখেন তাহলে......

অবহেলা ভরা কণ্ঠে বললো, মিসেস ইবন—আমি আমার স্বামীকে কমই গ্রাহ্য করি। তাছাড়া আমার স্বামী জানেন, আমি যা চাই বা কামনা করি,

তাতে বাধা দেবার সাধ্য তাঁর নেই। মিঃ আলম, আমি তো প্রথমে আপনাকে চোখেই দেখিনি, দেখেছিলেন আমার স্বামী। হাঁ, আপনার সঙ্গে তাঁরই পরিচয় হয়েছিলো সর্বপ্রথম। তিনিই আমাকে বলেছিলেন আপনার কথা—আপনার সৌন্দর্যের কথা। বলেছিলেন অপূর্ব এক মানুষ আপনি......

বনহুর বললো—আপনি একটু সোজা হয়ে বসুন, আমি আপনার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনছি।

এ ভাবে কি আপনার অসুবিধা হচ্ছে?

না, তবে হাঁও বটে, কারণ আপনি মোটেই হাল্কা নন......

আমি, আমি তবে?

বলুন, থামলেন কেন?

আমার ওজন আপনি সহ্য করতে পারছেন না?

ঠিক তা নয়, কারণ আপনার ওজন তেমন কোনো বেশি বলে মনে হয় না। আপনি পরস্ত্রী, আর আমি......

পর পুরুষ, এই বলতে চান?

ঠিক তাই, এবার বলুন এটা শোভনীয় কিনা?

আমার কাছে অশোভনীয় বলে কিছু নেই। আমি যা ভালবাসি তা অপরের কাছে যাই হোক, আমার কাছে শোভনীয়। আপনার সঙ্গ আমার ভাল লাগে, আর ভাল লাগে বলেই তো আমি সব গ্রাহ্যের সীমা অতিক্রম করে ছুটে আসি। মিঃ আলম, আপনি কেন আমাকে সহ্য করতে পারেন না, বলুন তো?

কে বললো আমি আপনাকে সহ্য করতে পারি না?

আমি নিজেই জানি, আর তার প্রমাণ হলো আপনি এই মুহূর্তে যা বললেন। যাক সে সব কথা, একটা কথা সঠিক করে বলুন তো?

কি সঠিক করে বলবো?

আমি কক্ষে প্রবেশ করবার পূর্বে আপনি কেন হেসেছিলেন? যে হাসির শব্দে আমার ঘুম ভেংগে গিয়েছিলো? আমি ছুটে এসেছিলাম এ কক্ষে? বলুন, বলুন কেন আপনি অমন করে অট্টহাসি হাসলেন?

বনহুর নিজকে যতই সংযত করে রাখুক না কেন, সে তো মানুষ, তাই এক অপরিচিতা নারীর এমন ঘনিষ্ঠতায় সে বিব্রত বোধ করছিলো, তবু মুখোভাবকে সংযত রাখতে চেষ্টা করে বললো—জানেন তো আমি ভূতের সাধনা করি।

হাঁ, জানি।

তাই আমার মধ্যে যা দেখেন সবই অস্বাভাবিক লাগে আপনাদের কাছে। যেমন আমি হাসলেও তা আপনাদের কাছে প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়।

সত্যি, আপনি কেমন যেন অদ্ভুত মানুষ। আচ্ছা মিঃ আলম, আপনি কি ভূতের সাধনা ত্যাগ করতে পারেন না?

মৃদু হেসে বললো বনহুর—না, কারণ এটা আমার জন্মগত দোষ। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললো সে—ভূতের সাধনা করি বলেই তো আমি বেঁচে আছি,. নাহলে কবে মরে আমিও ভূত বনে যেতাম।

মিসেস ইবন এবার সোজা হয়ে বসে, তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বনহুরের মুখের দিকে, তারপর বলে—মিঃ আলম, আমাকে ভূতের সাধনা শেখাবেন? আমিও ভূত দেখতে চাই।

বেশ, শেখাবো যদি আপনি আমার সঙ্গে একমতে আসেন। জানেন তো ভূতের সাধনা বড় কঠিন।

হাঁ, আমি আমার স্বামীর মুখে কিছু কিছু শুনেছি। সত্যি ভূতের সাধনা বড় কঠিন...কিছুটা আনমনা হয়ে যায় মিসেস ইবন। পুনরায় সে বনহুরের গায়ের উপর ঢলে পড়ে অসংযতভাবে।

বনহুর ওকে ধরে ফেলে হাত দু'খানা দিয়ে, ওর মুখ থেকে তখন কেমন যেন একটা বিশ্রি গন্ধ বের হচ্ছিলো বুঝতে পারে বনহুর মিসেস ইবন আজ বেশিমাত্রায় সুরা পান করেছে। বললো বনহুর—চলুন, আপনাকে আপনার কক্ষে পৌঁছে দিয়ে আসি!

না, আমি যাবো না। আমার স্বামী সুবিধার লোক নয়, এ কথা আপনি হয়তো জানেন না।

জানি, আপনার স্বামী নিজেই এ কথা আমাকে বলেছেন, তিনি নাকি আপনার যোগ্য স্বামী নন।

বলেছিলেন তিনি?

হাঁ বলেছিলেন।

একটু আনমনা হয়ে যায় মিসেস ইবন, বললো সে—জানেন মিঃ আলম, মিঃ ইবনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে আমার জীবনটা সম্পূর্ণ বিফল হয়ে গেছে। হাঁ জানেন...আর জানেন বলেই তিনি সবার কাছে বলেন। লোকটা আমাকে কষ্ট দিতে চান না, কিন্তু...

থামলো মিসেস ইবন। তার চোখেমুখে একটা চিন্তার ছাপ ফুটে উঠলো।

এমন সময় ডাকবাংলোর পিয়ন এসে একখানা চিঠি দিয়ে যায় বনহুরের হাতে।

মিসেস ইবন চিঠিখানা নিতে যায় বনহুরের হাত থেকে।

বনহুর উঠে দাঁড়ায়, চিঠিখানা হাতে নিয়ে মুক্ত জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়, খুলে ফেলে সে দ্রুতহস্তে, চিঠিতে লেখা আছে মাত্র দুটো কথা......

খুনীর সন্ধান করতে এসে নিজেই
খুন হতে চলেছো। সাবধান, আর
একটা দিনও তুমি ফাংহায় অবস্থান
করবে না। ফিরে যাও নিজের দেশে।
—টাইগার

চিঠির শেষ অংশে একটা বাঘের ছবি আঁকা রয়েছে। বনহুর মৃদু হেসে চিঠিখানা ভাঁজ করে রাখলো নিজের পকেটে।

মিসেস ইবন উঠে এলো নিজের আসন থেকে, বললো—কার চিঠি মিঃ আলম?

বনহুর স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো—আমার এক বন্ধুর চিঠি।

কি লিখেছে বললেন না তো?

নিমন্ত্রণপত্র বলতে পারেন, কারণ বন্ধু আমাকে তার আবাসে যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

মিসেস ইবন খিল খিল করে হেসে উঠলেন, তারপর হাসি থামিয়ে বললেন—আপনি বড় সৌভাগ্যবান, তাই আপনার জন্য......

বলুন, থামলেন কেন?

নিমন্ত্রণপত্র।

হাঁ মিসেস ইবন, আপনি যা বলেছেন সত্য আমি সৌভাগ্যবানই বটে।

এমন সময় বাইরে পদশব্দ শোনা গেলো, কেউ যেন ব্যস্তভাবে এই কক্ষের দিকে এগিয়ে আসছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কক্ষে প্রবেশ করলেন মিঃ আর্ম, চোখেমুখে তার উদ্বিগ্নতা ব্যস্তকণ্ঠে বললো সে—এ্যামি, এ্যামি, সর্বনাশ হয়েছে, মিঃ ইবন নিহত হয়েছেন।

মিঃ ইবন অর্ধশায়িতভাবে সোফায় হেলান দিয়ে বসেছিলো, সে সোজা হয়ে বসে বললো—অসময়ে এমন ঠাট্টা না করলেই কি নয়?

ঠাট্টা! কে তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে এ্যামি। এসো নিজের চোখে দেখবে এসো....

মিঃ আর্ম এ্যামির হাত ধরে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

বনহুর মিঃ আর্মের কথা অবিশ্বাস করতে পারলো না, কারণ মিঃ ইবন সম্বন্ধে সে এমন ধরণের ঠাট্টা করতে পারে না, আর ঠাট্টা করার সময় এটা নয়। তবুও বলা যায় না, বোনকে সে সচেতন করার জন্য এ ধরণের কথা বলতেও পারে।

বললো বনহুর—মিসেস এ্যামি, আপনি মুহূর্ত বিলম্ব না করে নিজ কামরায় চলে যান, দেখুন আপনার ভাই আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছে না সত্য বলছে।

মিসেস এ্যামি এবার বললো—হাঁ, দেখি আর্ম তুমি সত্য বলছো কিনা? মিঃ আলম, দয়া করে আপনিও আসুন।

বনহুর বললো—আমাকে যাবার জন্য অনুরোধ করতে হবে না, মিসেস এ্যামি!

মিঃ আর্ম বললেন—তবে চলুন।

পাশের কামরায় প্রবেশ করে স্তব্ধ হয়ে গেলো বনহুর। মেঝের মাঝখানে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন মিঃ ইবন, তাঁর চারপাশে রক্তের বন্যা বয়ে চলেছে। বুকের মাঝখানে লম্বালম্বিভাবে চিরে ফেলা হয়েছে। এখনও তাজা রক্তের ঢেউ গড়িয়ে যাচ্ছে মেঝের নিম্নস্তরের দিকে।

বনহুর বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে মিঃ ইবনের মৃত দেহের দিকে।

মিসেস এ্যামি স্বামীকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো, মুহূর্তের জন্য ভাই আর্মকে জড়িয়ে ধরে পুনরায় ছেড়ে দিয়ে বললো—আর্ম, কেন তুমি আজ ইবনকে একা রেখে পাশের কামরায় ঘুমিয়েছিলে? বলো, কেন তুমি আজ ইবনের পাশে শোওনি? বলো জবাব দাও?

আর্ম বারবার রুমালে চোখ মুছছিলো, সে বললো—আমি কিছু পূর্বে তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলাম, কারণ আমার কক্ষ খুব ছোট, তাছাড়া আমার কক্ষে কোন ইলেকট্রিক পাখা ছিলো না, তাই বড় গরম বোধ করছিলাম।

বুঝেছি, গরম বোধ হওয়ায় আমার কামরায় আসছিলে।
হাঁ বোন ঠিক তাই, কিন্তু দরজার পাশে এসে দেখলাম কক্ষ অন্ধকার, কক্ষে কেউ যেন পায়চারী করছে। আমি মনে করলাম তুমি কক্ষে আছো, হয়তো ইবন পায়চারী করছেন। তোমরা প্রায়ই রাগারাগি করো কিনা, তাই আমার মনে এমনি একটা ধারণা হয়েছিলো। দরজা খোলা থাকলেও আমি ভিতরে প্রবেশ না করে ফিরে গেলাম নিজের কামরায়।
তারপর, তারপর কি করলে আর্ম? কখন তুমি ইবনকে এ অবস্থায় দেখলে?
গিয়ে যখন শয্যা গ্রহণ করতে যাবো তখন একটা শব্দ আমার কানে এলো।
কি ধরণের শব্দ তোমার কানে এলো আর্ম?
সে এক অদ্ভুত শব্দ, ঠিক যেন একটা গোঙ্গানি শব্দ বলে মনে হলো আমার। আমি তখন লাফ দিয়ে শয্যা ত্যাগ করলাম এবং দ্রুত তোমাদের কামরার দিকে গেলাম।
মিসেস ইবন তখন আর্মের জামার আস্তিন এটে ধরে ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করে চললো—কি দেখলে তারপর, বলো কি দেখলে?
আর্ম শেষবারের মত রুমালে চোখ মুছে রুমালখানা পকেটে রাখলো, তারপর বললো—কক্ষের দরজা খোলা, কক্ষে নজর পড়তেই চমকে উঠলাম—মিঃ ইবন মেঝেতে পড়ে আছেন, তাঁর পাশে খানিকটা রক্ত গড়িয়ে পড়েছে। আমি দেখামাত্র তোমার সন্ধান করলাম। তুমি কক্ষে নেই, তাই আমি ছুটে গেলাম মিঃ আলমের কক্ষের দিকে। বাইরে পৌছতেই শুনতে পেলাম তোমার গলার আওয়াজ, তাই ভিতরে প্রবেশ করলাম।
মিঃ আর্মকে ছেড়ে দিয়ে স্বামীর বুকে আছড়ে পড়লো মিসেস ইবন, বিলাপ করে চললো সে কচি খুকীর মত।
বনহুর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কখন যে তার পিছনে একদল পুলিশ এসে দাঁড়িয়েছে, বনহুর বুঝতেই পারেনি।
ফিরে তাকাতেই আশ্চর্য হলো বনহুর, পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হাসেম রিজভী, যিনি তাকে হীরাঝিলে গ্রেপ্তার করেছিলেন। সেদিন বনহুর হীরাঝিলে গিয়েছিলো কোনো এক উৎসবে। নাচগানে ভরেছিলো সেদিন হীরাঝিল, রংমহলে উৎসব চলেছিলো। শহরের গণ্যমান্য বহু অতিথি এসেছিলেন, এসেছিলেন হীরাঝিলের রাজকুমারী মীরা। মীরার গলায় একটা

লকেটে ছিলো মূল্যবান একটা পাথর। ঐ পাথরখানাই ছিলো বনহুরের লক্ষ্য এবং সেই কারণেই সে গিয়েছিলো হীরাঝিলে। অন্যান্য অতিথির সঙ্গে সেও বসেছিলো। সম্মুখের টেবিলে নানাবিধ খাস্যসম্ভার, নানা ধরনের ফলমূলে পরিপূর্ণ টেবিলের পাত্রগুলো। রাজকুমারী মীরার পাশের টেবিলেই বসেছিলো বনহুর। এমন সময় পুলিশ ইন্সপেক্টার রিজভী দলবলসহ এসে আসন গ্রহণ করলেন। রিজভী বনহুরকে চিনতেন না, তাই তিনি পুলিশ প্রধান মিঃ রাব্বিকে সঙ্গে এনেছিলেন। রাব্বিও বনহুরকে প্রকাশ্যে দেখেননি, তিনি দেখেছিলেন তার একটা ছবি। যে মুহূর্তে পুলিশমহল হীরাঝিলের উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন, সে সময় রাব্বির পকেটে ছিলো বনহুরের ছবি। তাই তিনি উৎসবে যোগ দেবার পর পরেই চতুর্দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলেন। বনহুর তখন রাজকুমারী মীরার দিকে লক্ষ্য রেখে একটা ফল সবেমাত্র তুলে নিয়েছে হাতে, ঠিক ঐ মুহূর্তে পিছনে একটা শক্ত বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করে সে। বনহুর ফিরে তাকাতেই চমকে উঠে, কারণ তার পিঠে রিভলবার চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন মিঃ রাব্বি। আশেপাশে আরও কয়েকজন পুলিশ অফিসার তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন। বনহুর একটুও বিব্রত বোধ করলো না বা কিছুমাত্র ঘাবড়ে গেলো না, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন সেদিন। মিঃ রিজভী তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছিলেন। উৎসব মঞ্চ থ' হয়ে পড়েছিলো, একটা ভয়ঙ্কর কিছু হঠাৎ যেন ঘটে গেলো। সবার মুখমণ্ডল বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিলো। বনহুর হাসিমুখে বেরিয়ে এসেছিলো সেদিন মিঃ রিজভী আর মিঃ রাব্বির সঙ্গে উৎসবমঞ্চ থেকে। সেদিন বনহুর গ্রেপ্তার হয়েছিলো কতকটা নিঃশব্দে। শহরের কেউ তেমন করে জানতে পারেনি এই সংবাদখানা।

কিন্তু পুলিশমহল বেশিক্ষণ সেদিন আটকে রাখতে পারেনি বনহুরকে। বনহুর পুলিশবাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে সরে পড়েছিলো গাড়ি থেকে। এ ব্যাপারে পুলিশমহলের কম শাস্তি হয়নি, নাকানিচুবানি খেয়েছিলেন পুলিশ অফিসারগণ।

সংবাদটা অবশ্য পৌঁছেছিলো চৌধুরীবাড়িতে। মা এবং মনিরা কেঁদেকেটে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। এরপর পরই বনহুর পুনরায় বন্দী হয় নাহার মঞ্জিলে। হঠাৎ বনহুরের চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, মিঃ রিজভী নিহত মিঃ ইবনের দিকে ঝুকে পড়ে বলেন—আশ্চর্য, এ হত্যাকাণ্ডও দেখছি প্রতিদিনের নিহত ব্যক্তিদের মত একইভাবে সংঘটিত হয়েছে।

বনহুর নিজেও লক্ষ্য করেছিলো এটা, মিঃ ইবনকে যারা হত্যা করেছে, তারাই ফাংহার হত্যাকাণ্ডের অধিনায়ক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মিঃ রিজভী যখন নিহত মিঃ ইবনকে নিয়ে ব্যস্ত, তখন বনহুর আলগোছে পিছন থেকে সরে গেলো এবং অল্পক্ষণেই সে ফিরে এলো সেখানে, কিন্তু কেউ তাকে চিনতে পারলো না।

মিঃ আর্ম একটু পরে যখন মিঃ আলমের সন্ধান করলেন তখন তাকে আর খুঁজে পেলো না। আশ্চর্য হলেন আর্ম, মিঃ আরম গেলো কোথায় মিঃ আলম তাদেরই পাশে দাঁড়িয়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখে কথাবার্তা বলছে।

বনহুর এখন একজন পুলিশ বনে গেছে। খান দেওয়ানের রূপ নিয়েছে সে সকলের অলক্ষ্যে। খান দেওয়ান পুরাতন পুলিশ, বয়স তার পঞ্চাশের কাছাকাছি। মুখভরা দাঁড়ি-গোঁফ, জাতিতে সে শিখ।

বয়স হলেও তার দেহের গঠন বলিষ্ঠ, মাংসপেশীগুলো মজবুত, লম্বা দেহ, মাথায় পাগড়ি, চোখে কালো চশমা।

অবশ্য ফাংহা পুলিশবাহিনীর যে ড্রেস, সেই ড্রেসই দেওয়ানবীর দেহে রয়েছে। সূতীক্ষ্ণ নাসিকা যেন রক্তে রাঙা মনে হয়। কালো কাঁচের চশমার নিচে নীল দুটি চোখ।

মিঃ ইবনের লাশ পরীক্ষা শেষ করে মিঃ রিজভী ও তাঁর সহকারীরা লাশ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন, তারপর বিদায় গ্রহণ করলেন তাঁরা।

মিসেস ইবন কেঁদেকেটে আকুল হলেন।

ভাই মিঃ আর্মও তাঁর ভগ্নিপতির জন্য মাথা ঠুকে বিলাপ করতে লাগলেন।

মিঃ রিজভী সহকারীদের সঙ্গে নিয়ে বিদায় গ্রহণ করার সময় দু'জন পুলিশ ডাকবাংলোয় প্রহরায় রেখে গেলেন, তাদের মধ্যে একজন দেওয়ানজী অপরজন মহাতক সিপাই। দু'জনই বয়সী এবং বুদ্ধিমান, তাই রিজভী সাহেব রেখে গেলেন ওদের দু'জনকে। যাবার সময় বলে গেলেন খুব সজাগভাবে পাহারা দিবে, যাতে এই ডাকবাংলোয় নতুন কোনো অঘটন না ঘটে। বিশেষ করে মিসেস ইবনের জন্যই মিঃ রিজভী এমন সতর্কতার ব্যবস্থা করলেন।

❑

এক সময় ড্রেসিংরুমে প্রবেশ করে বনহুর। হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় আসল দেওয়ানজী পড়ে আছে এক পাশে। দেহে তার শুধু গেঞ্জি আর আণ্ডারওয়্যার। বনহুর দ্বিতীয় দেওয়ানজী বনে বসে আছে, সে ঐ কক্ষে প্রবেশ করে হাঁটু গেড়ে বসলো প্রথম দেওয়ানজীর পাশে। বললো—কোনো কষ্ট হচ্ছে তোমার?

গোঁ গোঁ করে কিছু বললো দেওয়ানজী, অবশ্য তার মুখ বাঁধা থাকায় এমন শব্দ হচ্ছে বুঝতে পারলো বনহুর। সে মুখের রুমাল খুলে ফেলে বললো—কোনোরকম চিৎকার করার চেষ্টা করো না..... কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রিভলবার বের করে চেপে ধরলো দেওয়ানজীর বুকে।

দেওয়ানজী কোনো জবাব দিলো না বা দেবার সাহস সে পেলো না। দ্বিতীয় দেওয়ানজীর মুখের দিকে তাকিয়ে ফিরে তাকালো বুকের রিভলবারের দিকে।

বনহুর বললো—ভয় নেই, আমি তোমাকে হত্যা করবো না, যতদিন আমার কাজ সমাধা না হবে ততদিন তোমাকে এ অবস্থায় থাকতে হবে। কোনো কষ্ট আমি তোমাকে দিবো না।

দেওয়ানজী দ্বিতীয় দেওয়ানজীর কথায় কতকটা আশ্বস্ত হলো, যা হোক প্রাণে বাঁচলেও বাপের নাম রক্ষা পাবে। বললো দেওয়ানজী—আমাকে আপনি হত্যা করবেন না তো?

বললাম তো তোমাকে আমি হত্যা করবো না। যতদিন আমার কাজ সমাধা না হবে......

তারপর কি করবেন?

মুক্তি দেবো।

আপনি আমার বেশ ধারণ করেছেন কোন্ উদ্দেশ্যে?

উদ্দেশ্য আছে, তবে এখন তুমি জানতে পারবে না দেওয়ানজী, পরে জানাবো। বনহুর বেরিয়ে গেলো, একটু পরে ফিরে এলো—হাতে তার কয়েকখানা রুটি আর কিছু মাংস।

দেওয়ানজীর সম্মুখে রুটি আর মাংস রেখে বললো বনহুর—নাও, এবার খেয়ে নাও।

দেওয়ানজী ক্ষুধার্ত ছিলো, সে খাবার সম্মুখে পেয়ে গোগ্রাসে খেতে শুরু করলো।

যতক্ষণ দেওয়ানজীর খাওয়া শেষ না হলো ততক্ষণ বনহুর বসে রইলো তার পাশে। খাওয়া শেষ হলে বললো বনহুর—এবার তোমাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে হবে। বনহুর কথা শেষ করেই দ্রুতহস্তে দেওয়ানজীর মুখ এবং হাত-পা শক্ত দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো, তারপর ড্রেসিংরুমের দরজায় তালা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলো সে।

বাইরে বসে বসে ঝিমুচ্ছিলো মহাতক সিপাই, বনহুর এসে দাঁড়ালো তার পাশে। কাঁধে হাত রাখতেই চমকে উঠলো সে ভীষণভাবে। অপরাধীর মত মুখ ফ্যাকাশে করে তাকালো সে দেওয়ানজীর মুখের দিকে, তারপর বললো—মাফ করো ভাই, আমি ঘুমাইনি।

বনহুর মনে মনে খুশিই হলো, যাক বিলম্বের জন্য মহাতক তাহলে কোনো প্রশ্ন করবে না। দেওয়ানজী এবার বসলো তার পাশে—তুমি আর আমি ভাই ভাই, তুমি ঘুমাবে আমি পাহারা দেবো, আর আমি ঘুমাবো তুমি পাহারা দিবে। নাও, এবার ঘুমাও......

বলো কি ভাই, আমি ঘুমাবো?

হাঁ, তুমি ঘুমাও আমি সজাগ আছি। তারপর আমি ঘুমাবো তুমি সজাগ থেকো।

সত্যি বলছো?

মিথ্যে আমি বলেছি কোনোদিন?

আচ্ছা দেওয়ানজী, তোমার গলার আওয়াজ কেমন যেন আলাদা মনে হচ্ছে।

একটু কেশে বলে বনহুর—নতুন জায়গার নতুন পানি আমার সহ্য হচ্ছে না, তাই কেমন গলাটা বসে গেছে, তুমি ঘুমাও......

কিন্তু........

কোন কিন্তু নয় মহাতক, তুমি ঘুমাও।

মহাতক দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লো বন্দুকটা পাশে রেখে।

রাত তখন বারোটা।

দূরে কোনো গীর্জায় ঢং ঢং করে বারোটা বাজার সংকেতধ্বনি হলো।

বনহুর দেওয়ানজীর বেশে ডাকবাংলোর বারান্দায় পায়চারী করে চলেছে—তার জুতোর আওয়াজ হচ্ছে খট্ খট্ খট্......

রাত বাড়ছে।

আকাশ আজ মেঘাচ্ছন্ন।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মাঝে মাঝে মেঘের গুরু গুরু শব্দ হচ্ছে। চারিদিকে থমথমে ভাব বিরাজ করছে। ডাকবাংলোর ভিতর থেকে ভেসে আসছে মিসেস ইবনের কান্নার ক্ষীণ শব্দ।

মিঃ আর্ম তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে বলে মনে হলো, কারণ তাঁর কণ্ঠস্বরও ভেসে আসছে কক্ষ হতে।

এক সময় বৃষ্টি শুরু হলো।

ডাকবাংলোর ছাদে টুপটাপ শব্দ হচ্ছে। যেন একটা তীর এসে পড়ছে ছাদের উপর। সঙ্গে সঙ্গে মেঘের গর্জন আরও বাড়ছে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

বিদ্যুতের আলোতে বাংলোর জানালার শার্শীগুলো ঠক ঠক করে উঠছে।

মহাতকের নাসিকাধ্বনি হচ্ছে।

বনহুর থামলো, হঠাৎ মনে পড়লো আসল দেওয়ানজীর কথা। বেচারা সম্পূর্ণ নির্দোষ, তবু তাকে প্রয়োজনে কষ্ট দিতে হচ্ছে, হয়তো দেওয়ানজী ও ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণ।

বনহুর বাংলোর কক্ষে প্রবেশ করলো, দ্রুত দেওয়ানজীর পোশাক খুলে ফেললো এবং নিজের ড্রেস পরে নিলো, তারপর বেরিয়ে এলো বাইরে।

কক্ষের বাইরে এসে দাঁড়ালো, তখনও মিসেস ইবনের কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

বনহুর সেই কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে বললো—মিসেস এ্যামি, ভিতরে আসতে পারি?

মিসেস ইবনের পরিবর্তে শোনা গেলো মিঃ আর্মের গলা—আসুন।

বনহুর ভিতরে প্রবেশ করলো এবং মিসেস ইবনের শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালো।

মিঃ আর্ম মিসেস ইবনকে সান্ত্বনা দিয়ে চলেছেন।

বনহুর বললো—বিশেষ জরুরি কাজে বাইরে যেতে হয়েছিলো ফিরতে রাত হলো। মিঃ আর্ম, আমি দুঃখিত যে আজ আপনাদের বিপদ মুহূর্তে আপনাদের সান্ত্বনা দেবার সুযোগটুকুও পেলাম না।

মিসেস ইবন আরও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

মিঃ আর্ম কোনো জবাব দিলো না।

মিসেস ইবন বললেন—আমি আজ থেকে সব হারালাম মিঃ আর্ম। আমার স্বামী একজন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ব্যবহারে আমি সন্তুষ্ট না

হলেও তিনি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছু করেননি। বিশেষ করে তাঁর ব্যবসা সমূলে নষ্ট হয়ে গেলো......

নানারকম উক্তি উচ্চারণ করে চললো মিসেস ইবন।

মিঃ আর্ম বললেন—বসুন মিঃ আর্ম, দেখুন আপনি যদি বোন এ্যামিকে কিছু সান্ত্বনা দিতে পারেন।

কথাটা বলে মিঃ আর্ম বেরিয়ে গেলেন সেই কক্ষ থেকে।

মিসেস ইবনকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর—মিছামিছি কাঁদছেন কেন মিসেস ইবন। মৃত্যু এমন একটা জিনিস, যা থেকে কেউ পরিত্রাণ পাবে না। মৃত্যুর আস্বাদ সবাইকে গ্রহণ করতেই হবে। এমন কি আপনি, আমি কেউ রেহাই পাবো না এই অবস্থা থেকে।

ঠিক বলছেন মিঃ আলম—আপনি, আমি, কেউ এই অবস্থা থেকে রেহাই পাবো না। ঠিক বলেছেন কিন্তু......

বলুন কিন্তু কি?

এ মৃত্যু কি সবার জন্য কাম্য?

হাঁ,. এ কথা অবশ্য সত্য, মৃত্যু হবেই কিন্তু এক একজনের এক এক রকম অবস্থায়। যাক, রাত বেশি হলো, আপনি এবার ঘুমিয়ে পড়ুন......

বনহুর পা বাড়াতেই মিসেস ইবন তাকে ধরে ফেললো—আপনি যাবেন না মিঃ আর্ম, আপনি যাবেন না, জানেন আমি আজ কত একা?

মিসেস ইবন বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে বুকে মাথা রাখলো নিবিড়ভাবে?

বনহুর হঠাৎ এমন অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলো না, সে বললো—আমি আজ বড় ক্লান্ত, একটু ঘুমোতে চাই মিসেস ইবন। আপনি নিজেও ঘুমাননি একটু ঘুমান। মিসেস ইবনকে একরকম প্রায় জোরপূর্বক বিছানায় বসিয়ে ফিরে আসে বনহুর নিজে কামরায়। তখন বাইরে বেশ বৃষ্টি।

বাংলোর বারান্দায় দেয়ালে ঠেশ দিয়ে নাক ডাকাচ্ছে মহাতক সিপাই।

বনহুর বাংলোর মধ্যে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলো—তারপর ড্রেসিংরুমের তালা খুলে ফেললো, দেখলো মেঝেতে গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে আছে দেওয়ানজী।

বনহুর দরজা বন্ধ করে ফিরে এলো শয্যার পাশে।

শয্যায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে ভাবছে বনহুর হতভাগ্য মিঃ ইবনের কথা—কি মর্মান্তিক নির্মম মৃত্যু ঘটেছে তাঁর। লোকটা বড় সরল ও সোজা ছিলেন,

মিসেস ইবন এ কারণে সুখী হতে পারেননি স্বামীর আচরণে। কিন্তু তাঁকে এভাবে হত্যা করার পিছনে কি উদ্দেশ্য ছিলো হত্যাকারীর? ফাংহা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যদিও মিঃ ইবনের হত্যাকাণ্ডের মিল পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু আসলে এটা নির্ঘাত মিথ্যা। মিঃ ইবনকে হত্যাকারী হত্যা করেছে বিরাট কোনো উদ্দেশ্য সাধনে।

হঠাৎ দরজায় ধাক্কা পড়লো।

বনহুরের চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো, শয্যা ত্যাগ করে উঠে এলো দরজার পাশে, বললো—কে?

বাইরে থেকে কোনো জবাব এলো না, আরও জোরে ধাক্কা পড়লো।

বনহুর খুলে দিলো দরজা, কোথাও কেউ নেই। বাইরে এসে দাঁড়ালো. তাকালো সে নিপুণ দৃষ্টি মেলে, কিন্তু কাউকে দেখা গেলো না। বনহুর এগিয়ে এলো, মহাতক সিপাই তখনও দেয়ালে হেলান দিয়ে গভীরভাবে ঘুমাচ্ছে।

বনহুর ফিরে গেলো কামরায়।

❑

সেই আলোকস্তম্ভ।

পিশাচের মত কয়েকটা লোক দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে মেঝের মাঝখানে। এক একজন যেন এক একটা জীবন্ত যমদূত। নরপশুর মত তাদের মুখোভাব, চোখগুলো যেন শার্দুলের মত।

আলোকস্তম্ভটা ধীরে ধীরে উপরে উঠছে।

কেমন একটা লালচে আলো বের হচ্ছে আলোকস্তম্ভের মধ্য হতে।

তিনজন এপ্রোনপরা লোক দাঁড়িয়ে আছে। তারা একজন ডাক্তার, একজন বৈজ্ঞানিক, অপরজন হলো সার্জন। তাদের মুখে মাক্স, হাতে গ্লাব্‌স্, চোখে কালো কাঁচের চশমা।

সবাই উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছে আলোকস্তম্ভটার দিকে।

কক্ষমধ্যে আধো অন্ধকার।

আলোকস্তম্ভ থেকে একটা লালচে আলোকরশ্মি বের হচ্ছে। অদ্ভুত সে আলোকরশ্মি, কেমন যেন বিস্ময়কর লাগছে।

একটা শব্দ হলো আলোস্তম্ভের ভিতরে তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর—তোমরা ঠিক মত কাজ করে চলেছ, এ কারণে আমি যথেষ্ট খুশি হয়েছি......তোমাদের সতর্কতা ফাংহা পুলিশবাহিনীকেও হার মানিয়েছে......হার মানিয়েছে যিনি বিদেশ থেকে এসেছেন ফাংহা হত্যাকাণ্ড রহস্য উদঘাটনে তাকেও......হাঃ হাঃ হাঃ, সত্যি আমি না হেসে পারছি না, কারণ লোকটাকে আমি এখনও জীবিত রেখেছি......জানো, আমি ইচ্ছা করলে তাকে যে কোনো মুহূর্তে তার অনুচর আরজুর অবস্থায় পরিণত করতে পারি......

আলোকস্তম্ভ থেকে কথাগুলো থেমে থেমে বের হচ্ছিলো, যেন কোনো এক পর্বতের গুহা থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। কণ্টস্বর নারী না পুরুষের বুঝবার কোনো উপায় নেই। সে এক বিস্ময়কর আলোকস্তম্ভের ভিতরে মানুষের অবস্থান।

কক্ষটি ভূগর্ভে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পুনরায় আলোকস্তম্ভ হতে আওয়াজ এলো—আমি তা করবো না, আমি তাকে ফিরে যাবার জন্য নির্দেশ দিয়েছি...যদি সে আমার নির্দেশ না মানে তবে আমি বাধ্য হবো তাকেও ইবন কিংবা আরজুর অবস্থায় পরিণত করতে......

একজন বলে উঠলো—তাকে হত্যা করা ছাড়া কোনো পথ নেই কারণ সে কোনোক্রমে ফিরে যাবে না, যতদিন ফাংহা হত্যাকাণ্ডের মূল স্তম্ভ ভেঙ্গে ফেলতে সে সক্ষম না হয়েছে।

একটা অদ্ভুত হাসির শব্দ হলো আলোকস্তম্ভের মধ্যে...ফাংহা হত্যাকাণ্ডের, পিছনে রয়েছে বিরাট এক উদ্দেশ্য...সেই উদ্দেশ্য সে নস্যাৎ করে দিতে চায়...ওকে আর সুযোগ দেওয়া উচিত হবে না... অচিরেই ওকে দুনিয়া থেকে সরে ফেলতে হবে, যেমন প্রতিরাতে এক একজনকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলছি...কিন্তু যেদিন আমার উদ্দেশ্যে সফলতা আসবে সেদিন নতুন এক জগত সৃষ্টি হবে......

ঠিক ঐ সময় পিছমোড়া অবস্থায় সেখানে নিয়ে আসা হলো রহমানকে। আজ তারই উপর চলবে অস্ত্রোপচার। রহমানের বুক চিরে বের করে নেওয়া হবে তার হৃৎপিণ্ড। প্রায় সপ্তাহ হলো তাকে সজীব করে তোলার জন্য চলেছিলো চরম প্রচেষ্টা। আজ রহমানের শেষদিন।

চোখ দুটো ওর কালো কাপড়ে বাঁধা।

কক্ষমধ্যে নিয়ে এসে মেঝের মাঝখানে দাঁড় করানো হলো তাকে। দু'জন শক্তভাবে ধরে রয়েছে তাকে দু'পাশ থেকে।

স্তম্ভের ভিতর থেকে আওয়াজ এলো—ওর চোখের আবরণ খুলে দাও।

একজন খুলে দিলো রহমানের চোখের বাঁধন।

রহমানের চোখ দুটো মুক্ত হওয়ায় সে তাকালো সম্মুখে। আজ ক'দিন ধরে তাকে বন্দী অবস্থায় অন্ধকার কক্ষে রাখা হয়েছিলো, তাকে যে খাবার দেওয়ার কথা ছিলো তা দেওয়া হয়নি। যা দেওয়া হতো তা পাহারাদারগণ ভাগাভাগি করে ভক্ষণ করতো, যৎসামান্য ভক্ষণ করতে দিতো রহমানকে।

রহমান সম্মুখে তাকিয়ে আশ্চর্য হলো না কারণ এ দৃশ্য তার পরিচিত। আলোকস্তম্ভ মধ্যে যাকে সে এখন দেখতে পাচ্ছে এবং যার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে সেই হলো ফাংহা হত্যাকাণ্ডের একচ্ছত্র অধিপতি। রহমান রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়ছিলো, কিন্তু কোনো উপায় ছিলো না তার, কারণ এমন সতর্কতাপূর্ণ পাহারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় তার কাটেনি কোনোদিন। এ ছাড়াও দরজা-জানালা-বিহীন লৌহ কারাগার।

রহমানের চিন্তায় বাধা পড়লো, আলোকস্তম্ভের ভিতর থেকে শব্দ বেরিয়ে এলো—আজ এই যুবকের বুক চিরে বের করে নাও ওর হৃৎপিণ্ড, তারপর ইবনের বুকের মধ্যে তা বসিয়ে দাও যেমন করে ইবনের হৃদপিণ্ড তুলে নিয়েছে। ইবনের লাশ নিয়ে এসো এখানে।

রহমান বিস্ময়ভরা চোখে দেখলো, দু'জন লোক বেরিয়ে গেলো—অল্পক্ষণ পরই একটা শবাধার নিয়ে প্রবেশ করলো তারা। মেঝের মাঝখানে একটা টেবিল ছিলো, ঐ টেবিলে রাখলো শবাধারটা।

শবাধারের মধ্য থেকে বের করলো মিঃ ইবনের লাশ।

রহমান দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে। পাশে আরও একটা টেবিল ছিলো, শবাধার থেকে মিঃ ইবনের লাশ নিয়ে শুইয়ে দিলো সেই টেবিলটার একপাশে।

টেবিলের পাশে ইবনের মৃতদেহের ধারে কিছুটা জায়গা খালি রাখা হলো। রহমান বুঝতে পারলো, ঐ খালি জায়গাটুকুতে তাকে শোয়ানো হবে এবং তার হৃৎপিণ্ড কেটে বের করে নিয়ে বসিয়ে দেওয়া হবে মৃত ইবনের দেহে।

টেবিলের চারপাশে নানারকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং নানা ধরনের সার্চ লাইট।

টেবিলে মিঃ ইবনের মৃতদেহ শোয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে টেবিলে আলো জ্বলে উঠলো।

কক্ষমধ্যে সার্চ লাইট জ্বলে উঠার সঙ্গে সঙ্গেই সার্জন, ডাক্তার এবং বৈজ্ঞানিকের মধ্যে ব্যস্ততা পরিলক্ষিত হলো। তাছাড়াও অন্যান্য সবাই ব্যস্তভাবে এ ওর দিকে তাকাতে লাগলো।

দু'জন এসে দাঁড়ালো রহমানের দু'পাশে।

রহমানের চোখ দুটো বন্ধনমুক্ত হলেও এখনও তার হাতে দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা। কক্ষের লালচে আলোক রশ্মি ক্রমে হাল্কা হয়ে সাদা আকার ধারণ করলো।

রহমান তখন ভাবছে আজ তার জীবনের শেষ দিন। সে জানে না সর্দার কোথায় এবং সে কেমন আছে।

আলোকস্তম্ভের মধ্যে অদ্ভুত একটা মূর্তি, যেন একটা পাথরের পুতুল ধীরে ধীরে মুখ নেড়ে কথা বলছে। কতকটা ছায়ামূর্তির মত আবছা।

মূর্তি বলে উঠলো—তোমরা দ্রুত কাজ সমাধা করে নাও, বিলম্বে অঘটন ঘটতে পারে। যেমন করে হোক ইবনকে বাঁচাতেই হবে।

ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য করে বললো—ইবনের মৃতদেহ সজীব রাখার জন্য ইনজেকশান করা হয়েছে কি?

বৈজ্ঞানিক বললো—হাঁ, ঐ ইনজেকশান তক্ষুণি করা হয়েছে, যখন তাকে হত্যা করা হয় সেই মুহূর্তে।

রহমানের কানে কথাগুলো বিস্ময়পূর্ণভাবে প্রবেশ করে। সে বুঝতে পারে হত্যাকারী অত্যন্ত সজাগ, হত্যা করার পর মৃত ব্যক্তির দেহ সজীব রাখার জন্যও ইনজেকশান করে নেয়। তবে কি তাকেও হত্যা করার পর সজীব রাখার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে? কে জানে কি করবে ওরা, তবে এটা ঠিক যে, তার হৃৎপিণ্ড নিয়ে টেবিলে রক্ষিত মৃতদেহটার বুকে সংযোগ করা হবে। তারপর তার দেহ নিঃশেষ হয়ে যাবে, পচেগলে হয়তো শিয়াল কুকুরের ভোগ্য হবে—আর নয় তো সজীব রাখার ইনজেকশান দিয়ে তার দেহটাকে সজীব রাখা হবে, হয়তো অপর কোনো ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড কেটে বের করে নিয়ে পুনরায় তার বুকে বসিয়ে দেওয়া হবে। চলবে শুধু এই গবেষণা—খুনী তার কাজ করেই যাবে, যতদিন না তার উদ্দেশ্য সফল হয়। তার মুখমণ্ডল মৃত্যুভয়ে ভীত না হলেও কেমন যেন ভাবগম্ভীর মনে হচ্ছিলো, নানারকম চিন্তার উদ্ভব হচ্ছিলো তার মনে। রহমান ভাবছে একটু পরই তার জীবন

প্রদীপ নিভে যাবে। একটিবার সর্দারের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটলো না, সর্দার কেমন আছে কে জানে......

রহমান যখন নানা ধরনের চিন্তা করে চলেছে, তখন আলোকস্তম্ভের মধ্যে ছায়ামূর্তির চোখ দুটো দিয়ে যেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। একটা রশ্মি বেরিয়ে আসছে আলোকস্তম্ভ থেকে।

ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক এবং সার্জন ব্যস্তভাবে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। সবার মুখেই একটা ভীত ভাব ছড়িয়ে পড়েছে। এমন হচ্ছে কেন, আলোকস্তম্ভ হতে এ ধরনের আলোকরশ্মি বের হচ্ছে কেন।

হঠাৎ সব নিভে গেলো।

এমন কি সে ভূগর্ভ কক্ষটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হলো। ডাক্তার, সার্জন, বৈজ্ঞানিক এবং তাদের অনুচরবৃন্দ ভীত আতঙ্কিতভাবে কক্ষেদৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিলো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে জ্বলে উঠলো সার্চলাইট, পুলিশবাহিনীর সন্ধানী আলো। একদল পুলিশ ফোর্সসহ দেওয়ানজী প্রবেশ করেছে সেখানে।

রহমানের হাত দু'খানা তখনও পিছমোড়া অবস্থায় বাধা রয়েছে, তার চোখেমুখে বিস্ময় ঝরে পড়ছে। রহমান হতভম্ব হয়ে গেছে একেবারে, হঠাৎ পুলিশ ফোর্স এখানে এলো কি করে! এদের মধ্যে কেউ তার পরিচিতজন নেই। দু'জন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে একদল সশস্ত্র পুলিশ ফোর্স।

পুলিশ ফোর্স সেখানে প্রবেশ করতেই ডাক্তার, সার্জন এবং বৈজ্ঞানিক ও তাদের সহকারীরা পালানোর জন্য বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়লো।

কিন্তু দেওয়ানজী নিজে পুলিশ ফোর্সকে পরিচালনা করতে লাগলো দেওয়ানজী নির্দেশ দিলো—সবাইকে এই মুহূর্তে গ্রেপ্তার করে ফেলো তোমরা। নিজে কক্ষের গোপন দরজায় রাইফেল হাতে সতর্কভাবে দাঁড়িয়ে রইলো, যেন একজনও দৃষ্টির আড়ালে পালিয়ে যেতে না পারে।

দেওয়ানজী যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলো, এ জায়গায় তখন কোনো দরজার মুখ ছিলো না, শুধু একটা দেয়াল এবং দেয়ালে একটা চক্রাকারের যন্ত্র ছিলো।

পুলিশ অফিসারগণ পুলিশবাহিনীর কয়েকজনকে খোলা দরজায় রাইফেল হাতে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন যাতে কেউ পালাতে না পারে। কিন্তু আসলে, প্রকাশ্য দরজার দিকে ওরা কেউ অগ্রসর হলো না। দেওয়ানজী জানতো, আসল দরজা রয়েছে কোথায়—তাই সে এ জায়গায় রাইফেল বাগিয়ে

দাঁড়িয়েছিলো যাতে একটা প্রাণীও পালাতে না পারে। দেওয়ানজীর সূতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলের কাছে পরাজিত হলো ফাংহা হত্যারহস্যের অধিনায়ক।

ফাংহা পুলিশ ফোর্স গুপ্তকক্ষের সবাইকে এক এক করে বন্দী করে ফেললো।

দেওয়ানজী তখনও ঠিক ঐ জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, হাতে তার, উদ্যত রাইফেল।

ডাক্তার, সার্জন, বৈজ্ঞানিক সবার হাতেই হাতকড়া। অন্যান্য যারা ঐ কক্ষে ছিলো হত্যাকারীর অনুচরবৃন্দ, তাদের সবার হাতেই বেড়ি পড়েছে।

রহমান এখনও নির্বাক, সে শবাধারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে কতকটা চিত্রার্পিতের মত। টেবিলে মৃত মিঃ ইবন।

সবাইকে বন্দী করার পর দৃষ্টি গিয়ে পড়লো টেবিলে শায়িত মিঃ ইবনের মৃতদেহের উপর। চমকে উঠলেন মিঃ রিজভী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার।

মিঃ রিজভী বলে উঠলেন—আশ্চর্য, মিঃ ইবনের মৃতদেহ এখানে দেখছি! লাশ মর্গের টেবিল থেকে পূর্বেই উধাও হয়েছিলো কিন্তু......

মিঃ রিজভীর কথায় পুলিশ অফিসারগণ সবাই এগিয়ে গেলেন, ঝুঁকে পড়ে দেখলেন মিঃ ইবনের মৃতদেহ।

পুলিশ ফোর্স তখন বন্দীদের নিয়ে একদিকে ঘেরাও করে রেখেছে, কেউ যেন নড়াচড়া করতে না পারে সেদিকে পুলিশ বাহিনীর সতর্ক দৃষ্টি আছে।

পুলিশ অফিসারগণ মিঃ ইবনের লাশ দেখে শুধু বিস্মিতই হলেন না। তারা একেবারে স্তম্ভিত হতবাক হয়ে পড়েছেন, কারণ মর্গের টেবিল থেকে মিঃ ইবনের লাশ উধাও হবার ব্যাপারটা এখন সবার কাছে খোলাসা হয়ে গেলো।

অন্যান্য বন্দীর সঙ্গে রহমানকেও বেঁধে ফেলতে যাচ্ছিলো পুলিশ ফোর্স।

দেওয়ানজী বললো—ওর হাত পিছমোড়া অবস্থায় বাঁধা দেখা যাচ্ছে, কাজেই আমরা বুঝতে পারছি ঐ ব্যক্তি এই হত্যারহস্যের সঙ্গে জড়িত নেই।

দেওয়ানজীর কথাটা সবার কানে গেলো, মিঃ রিজভী বললেন—হাঁ সত্য কথা, ঐ ব্যক্তি নিশ্চয়ই এদের লোক নয়। ওকেও হত্যার জন্য বন্দী করে আনা হয়েছে।

রহমান তখন বললো—হাঁ সাহেব, আমি এদের লোক নই। আমাকে এরা ধরে এনেছিলো।

রহমান এখানে আসার পর যা যা সে দেখেছিলো এবং যা যা ঘটেছিলো সব কথা সে সংক্ষেপে পুলিশ ইন্সপেক্টার এবং তাঁর দলবলের কাছে বললো।

সব শুনে হতবাক বিস্মিত হলেন সবাই, তাঁরা বুঝতে পারলেন হত্যাকাণ্ডের মূল জায়গাই হলো এই ভূতলগর্ভের গোপন কক্ষ এবং এই কক্ষে যারা ছিলো তারা সবাই হত্যাকাণ্ডের অধিনায়ক।

পিঠ চাপড়ে দিলেন ইন্সপেক্টার মিঃ রিজভী দেওয়ানজীর, বললেন—ভাগ্যিস্ তোমাকে ডাকবাংলায় পাহারায় রেখেছিলাম, তাই তুমি খুনী বা হত্যাকারীদের আসল ঘাটির সন্ধান দিতে পারলে। মোটা বখশীস দেওয়া হবে তোমাকে।

দেওয়ানজী কোনো কথা বললো না, সে চুপ রইলো কিছুক্ষণ তারপর আলোকস্তম্ভের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললো—স্যার, আমরা হত্যাকারীর অনুচর বা সহকারীদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি আসল হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করতে পারি নি।

তার মানে? বললেন মিঃ রিজভী।

দেওয়ানজী বললো, আমরা যখন ভূগর্ভের সুড়ঙ্গপথে অগ্রসর হচ্ছিলাম তখন আপনারা লক্ষ্য করেছেন এক জায়গায় সুড়ঙ্গপথ রুদ্ধ ছিলো।

বললেন মিঃ রিজভী—হাঁ, কিছুটা আসার পর সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ দেখতে পেয়েছিলাম।

তখন আমি একটা সুইচে চাপ দিয়েছিলাম কিন্তু পরক্ষণেই পুনরায় অপর এক সুইচে চাপ দেই, নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের?

হাঁ আছে। বললেন অপর এক অফিসার।

মিঃ রিজভীও বললেন—হাঁ, আমিও লক্ষ্য করেছি। দেওয়ানজী তুমি প্রথম সুইচে চাপ দিতেই অদ্ভুত এক শব্দ আমরা শুনতে পেয়েছিলাম।

দেওয়ানজীও বললো—স্যার, আপনারা আরও লক্ষ্য করেছেন প্রথম সুইচটা ছিলো একটা কাচের বেষ্টনীর মধ্যে।

হাঁ, ছিলো। বললেন মিঃ রিজভী।

দেওয়ানজী বললো—ঐ সুইচে চাপ না দিলে আমরা ফাংহা হত্যাকারী কিংবা তার সহকারীদের কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারতাম না। স্যার, যদিও আসল হত্যাকারী যে তাকে আমরা পাকড়াও করতে পারলাম না—তবু, যে অদ্ভুত স্তম্ভ দেখছেন, ওর মধ্যেই আছে আসল হত্যাকারী......

একসঙ্গে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন পুলিশ অধিনায়কগণ—বলো কি দেওয়ানজী!

মিঃ রিজভী বললেন—তবে যে তুমি বললে হত্যাকারীর মূল অধিনায়ককে আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলাম না।

তা অবশ্যি সত্য স্যার, হত্যাকারীদের অধিনায়ককে আমরা জীবন্ত অবস্থায় পাকড়াও করতে সক্ষম হইনি। ঐ স্তম্ভের অভ্যন্তরে আছে তার মৃতদেহ...

কি বলছো দেওয়ানজী! বলে উঠেন মিঃ রিজভী।

তার সঙ্গে অন্যান্য পুলিশ অফিসার সবাই আশ্চর্য হয়ে নানারকম উক্তি উচ্চারণ করেন।

পুলিশ ফোর্সও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে। তারা উদ্যত রাইফেল এবং মেশিনগান হাতে বন্দীদের সবাইকে বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে আছে। এতটুকু অসতর্ক হলে যদি কোনো অঘটন ঘটে তাই সবাই সজাগ আছে।

দেওয়ানজী বললেন—আরও একটা কথা স্যার, ফাংহা হত্যাকাণ্ডের অধিনায়ক পুরুষ নয়—নারী!

বলো কি দেওয়ানজী, ফাংহা হত্যারহস্যের অধিনায়ক পুরুষ নয় নারী?

হাঁ স্যার, এক্ষুণি আপনারা তার প্রমাণ পাবেন, আসুন আমার সঙ্গে......

সবাই দেওয়ানজীকে অনুসরণ করে সেই অদ্ভুত আলোকস্তম্ভের, দিকে অগ্রসর হলেন। যদিও আলোকস্তম্ভটা তখন আলোকরশ্মি বিকিরণ করছিলো না, কেমন যেন নিষ্প্রভভাবে দাঁড়িয়েছিলো মৃত জীবের মত।

দেওয়ানজী অদ্ভুত স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে একটা চক্রাকার সুইচের হ্যাণ্ডেল ঘুরাতে লাগলো। মাত্র এক মিনিট, সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভটির মুখ খুলে গেলো, সেইদিক দিয়ে বেরিয়ে এলো ভিতর থেকে সেই ছায়ামূর্তি।

হতবাক বিস্মিত সবাই, কারও মুখে কোনো কথা সরছে না। দেওয়ানজী যেন কোনো যাদুকর, তাই সে যাদুর খেলা দেখাচ্ছে।

স্তম্ভের ভিতর থেকে বের হলো একটা রবার আচ্ছাদিত মনুষ্য দেহ! তখন মনুষ্য দেহটাকে দেখা যাচ্ছেনা বা তাকে চিনবার কোনো জো নেই। রবার আচ্ছাদিত মনুষ্যদেহটা ছিলো আরও একটা কাঁচ আচ্ছাদিত পাত্রের অভ্যন্তরে। কাঁচ পাত্রটাসহ বেরিয়ে এলো।

দেওয়ানজী একটা বস্তু হাতে নিয়ে আঘাত করলো কাঁচপাত্রের উপর। সঙ্গে সঙ্গে কাঁচপাত্র চারপাশে খসে পড়লো। এবার রাবার আচ্ছাদিত মনুষ্যদেহটা পড়ে রইলো।

দেওয়ানজী পকেট থেকে চাকু বের করে চিরে ফেললো রাবার আচ্ছাদিত আবরণটা।

আশ্চর্য দৃষ্টি মেলে সবাই দেখলো একটা নারীদেহ বেরিয়ে এসেছে। দেওয়ানজী তার মুখের আবরণ উন্মোচন করে ফেললো।

একি, এ যে মিসেস ইবন!

মিসেস ইবন তাহলে ফাংহা হত্যাকাণ্ডের অধিনায়িকা!

মিঃ রিজভী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার থ' হয়ে গেছেন একেবারে, সবার চোখেমুখেই রাজ্যের বিস্ময়।

এমন কি রহমানও একেবারে অবাক হয়ে গেছে। মিসেস ইবনকে সে ডাকবাংলোয় দেখেছিলো এক সময়, অবশ্য যেদিন তারা সর্বপ্রথম ডাকবাংলোয় আস্তানা নিয়েছিলো, সেইদিন দেখেছিলো সে অল্পক্ষণের জন্য।

মিঃ ইবনের হত্যাকারী তাহলে তারই স্ত্রী মিসেস ইবন? কথাটা বললেন মিঃ রিজভী।

মিঃ রিজভী, কেন সবাই বিস্মিত হয়েছেন? ফাংহা হত্যারহস্যের অধিনায়ক একজন নারী—এ কথা বড়ই আশ্চর্য! এমন কি হত্যাকারিণীর অনুচরবৃন্দও জানতে পারেনি তাদের অধিনায়ক বা নায়িকাকে।

মিঃ রিজভী ফাংহা হত্যাকাণ্ডের মূল নায়িকা মিসেস ইবনের মৃতদেহ ও তার সহচরদের বন্দী করে নিয়ে রওনা দিলেন। সঙ্গে নিলেন রহমান ও ইবনের লাশটা।

ফিরে এলো সবাই ফাংহা শহরে।

পরদিন ফাংহা শহরময় ছড়িয়ে পড়লো কথাটা। সংবাদপত্রে ঘটনাটা বিস্তারিত প্রকাশ পেলো নানাভাবে।

পুলিশ অফিসে লোকে লোকারণ্য হলো। ফাংহা হত্যাকাণ্ডের মূল নায়িকাকে দেখার জন্য জনস্রোত বইলো ফাংহার রাজপথে।

সবার মুখেই দেওয়ানজীর প্রশংসা। একজন সাধারণ শিখ পুলিশ সেই কিনা ফাংহা হত্যা রহস্যের মূল উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে!

কথাটা একসময় আসল দেওয়ানজীর কানে এসে পৌঁছলো অবশ্য দ্বিতীয় দেওয়ানজীর মুখেই সে শুনলো নিজের কৃতিত্বের কথা।

দ্বিতীয় দেওয়ানজী প্রথম দেওয়ানজীকে সব খুলে বললো—কি কারণে তাকে এভাবে আটক করে সে তারই বেশ ধারণ করে রাতের পর রাত সন্ধান করে ফিরছে ফাংহা হত্যা রহস্যের।

সব শুনে বিস্মিত হলো আসল দেওয়ানজী। তাকে বললো দ্বিতীয় দেওয়ানজী, তোমাকে ঠিকমত অভিনয় করতে হবে, পুলিশ অফিসারগণ যেন বুঝতে না পারে তুমি নও। মোটা বখশিস পাবে, আমিও তোমাকে মোটা অংক দেবো, কিন্তু সাবধান কোনো সময় আসল কথা বলবে না।

প্রথম দেওয়ানজী কান নাক মলে বললো—না না, এমন ভুল কোনো সময় হবে না, আপনি আমাকে জীবনে না মেরে জীবন দান করেছেন, এ কথা আমি ভুলবো না।

দ্বিতীয় দেওয়ানজী নিজের পোশাক খুলে সরিয়ে দিলো প্রথম দেওয়ানজীকে, তারপর মুক্ত করে দিয়ে বললো—যাও এবার, তোমার ছুটি।

দেওয়ানজী বেরিয়ে গেলো।

বনহুর বাথরুমে প্রবেশ করলো। আজ বনহুর নিজকে অনেকটা হাল্কা মনে করছে, কারণ ফাংহা হত্যা রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে সে, অনেকক্ষণ আরামে বসে রইলো পানির ঝরণার নিচে।

ঠাণ্ডা পানির ঝাপটায় দেহটা শান্ত হলো, বেশ ভাল লাগছে তার। অবশ্য রহমান এখনও পুলিশ অফিস থেকে ছাড়া পেয়ে ডাকবাংলোয় ফিরে আসেনি। হয়তো একটু পরেই এসে যাবে......তোয়ালে দিয়ে মাথাটা মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলো বনহুর।

যেমনি সে মুখ থেকে তোয়ালে সরিয়ে নিয়েছে, অমনি সম্মুখে দেখলো জমকালো একটা রিভলবারের হিম শীতল নয়। মুহূর্তে সে সজাগ হয়ে দাঁড়ালো।